ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ।। ৭ চৈত্র ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২২ মার্চ, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মুসলিম সংরক্ষণ

সংশয়ের কাঁটা

হাফিজ ইব্রাহিম।। দু'হাজার দশের ৯ ফেব্রুয়ারি খবরের কাগজ খুলেই মুস্‌লিম সম্প্রদায় যে খবরটি দেখলেন তাতে তাঁদের উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করার কথা। কিন্তু যেহেতু খবরটি বেরিয়েছে স্বয়ং বুদ্ধদেব ভট্‌চাজের মুখ থেকে, যিনি কিনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং যিনি এই সেদিন সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের ঘটনার অনেক বাণী দিয়েছেন আর পাল্টি খেয়েছেন, তাই বেশীর ভাগ মুসলমান কথাটা নিয়ে ভাবতে বসেছেন। খবরের কাগজ অনুসারে বুদ্ধদেববাবু সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন—পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের জন্য শিক্ষা এবং কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে দশ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে। সন্দেহ নাই আপাত দৃষ্টিতে মুসলমানদের ক্ষেত্রে

সোজা-সাপ্টা

এটা আনন্দের খবর। কিন্তু কতগুলি প্রশ্ন সারা রাজ্যের মুসলমানদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।

প্রথমত, দীর্ঘ তেত্রিশ বছর রাজ্যে কায়েম হয়ে থেকে, হঠাৎ আজ মুসলমানদের নিয়ে এত উদারতা কেন? এতদিন কি ওদের পিছিয়ে থাকাটা নজরে পড়েনি?

দ্বিতীয়ত, সমগ্র মুসলমান সমাজ তার ধর্মগত কারণেই কি 'পিছিয়ে পড়া' বলে গণ্য হলো? তা যদি না হয় তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তো আরও অনেক আছে, তাদের উল্লেখ না করে কেবল পিছিয়ে পড়া মুসলমান বলা হলো কেন?

তৃতীয়ত, অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী যোগেশ বর্মন বলছেন—মুসলমানের যে বারটি গোষ্ঠী ও বি সি বলে চিহ্নিত আছে তারা আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকাতেই তাদের ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুর মত মুসলমান সমাজেও জাত পাতের বিভেদ আছে। শিয়া সুন্নী ছাড়াও আরও বহু উপগোষ্ঠী মুসলমান সমাজে আছে এটা তো অনেক মুসলমান জানেন না, যোগেশবাবু মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ জারি করতে গররাজি হচ্ছেন কারণ সমগ্র মুসলিম সমাজটাকে 'পিছিয়ে পড়া' বলা যায় কি?

চতুর্থত, তবে কি কেবলমাত্র ভোটের দিকে তাকিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক গুছিয়ে রাখার জন্য এটি একটি ভাঁওতা মাত্র?

১০ ফেব্রুয়ারির **The Times of India** পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

ব্যাকফুটে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম

হবসবমকে মিথ্যেবাদী সাজানোর চেষ্টা

গূঢ়পুরুষ।। আলিমুদ্দিনে সি পি এমের রাজ্য দপ্তরে যে সাংবাদিকরা নিয়মিত খবর সংগ্রহে যাতায়াত করেন তাঁরা সকলেই একমত যে, সেখানে সাধারণ হোলটাইমার কর্মীরা সম্প্রতি একটু বেশিরকম চুপচাপ। কেমন যেন নেতিয়ে পড়া মুখ সকলের। সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের অতি পরিচিত কর্মীও এখন চেনা সাংবাদিককে না চেনার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ, একটা অলিখিত বার্তা পার্টি কর্মীরা পেয়েছেন যে, বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম জুটি দলকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এই জুটির প্রতি সাধারণ পার্টি কর্মীদের মনে প্রচুর ক্ষোভ। জঙ্গলমহল এলাকায় বহু পার্টি কর্মী মাওবাদীদের হাতে খুন হয়ে গেলেও এই জুটির একজনও নিহত কর্মীদের পরিবারের পাশে দাঁড়াননি। জেলার নেতাদের পাঠিয়ে দায়িত্ব সেরেছেন। ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জেলা পার্টির সঙ্গে রাজ্য পার্টির সংঘাত এখন আর কোনও গোপন কথা নয়। প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে 'ওঁরা কলকাতায় নিরাপদে বসে খবরের কাগজে গরম গরম বিবৃতি দেবেন। আর আমরা এখানে পার্টি করি বলে খুন হয়ে যাব।' জেলা

এরিক হবসবমকে

স্তরের পার্টি কর্মীদের এমন বিরূপ মনোভাবের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সম্প্রতি জেলা সফরে যেতে বাধ্য করেছে।

বিমান-বুদ্ধ-নিরুপমের জন্যই যে পার্টি এখন ব্যাকফুটে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর অনেক উদাহরণ আছে। তার মধ্যে দুটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লখ করলে বোঝা যাবে, এই ত্রয়ীর নেতৃত্বে পার্টির এখন হাঁড়ির হাল। প্রথমটি, চল্লিশ বছর আগে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিরুপম সেনকে পিছনের দরজা দিয়ে বেআইনীভাবে মুক্ত করে আনার ঘটনা। সম্প্রতি কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডে নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার, অনিল বসুরা আদালতে দণ্ডিত হয়েছিলেন কি না? যদি দণ্ডিত হয়ে থাকেন, তবে বিচারালয়কে এড়িয়ে কীভাবে তাঁদের মুক্ত করা হয়? তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ১৯৯৬ সাল থেকে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন নিরুপম সেন। প্রতিবারই তিনি নির্বাচনী নিয়মবিধি মেনে

(এরপর ৪ পাতায়)

ফিনসের উদ্যোগে জাতীয় নিরাপত্তা সভা

দেশের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের চিহ্নিত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অভ্যন্তরীণ আর বাইরের নিরাপত্তার বিষয়টা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সর্বাগ্রে দরকার দেশের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের চিহ্নিত করা। তারপর তো বাইরের শত্রুরা আছেই। বাইরের শত্রুদের লক্ষ্যই থাকে অভ্যন্তরীণ শক্তিটার পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা। এই বাধা সৃষ্টির প্রাথমিক কৌশল অবশ্যই 'কূটনৈতিক' পদ্ধতিতে কথা চালাচালিতে 'সময় নষ্ট' করা। আর এরই পরবর্তী কৌশল ভেতরের শত্রুকে দিয়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষতিসাধন করানো। বোঝাই যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের আর হেলা-ফেলা করার মতো পরিস্থিতি নেই। হরিদ্বারে ফোরাম ফর ইনট্রিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি (ফিনস) আয়োজিত দু'দিনের 'জাতীয় নিরাপত্তা সভা' শীর্ষক আলোচনাচক্র এভাবেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল দেশের শত্রুদের। বিশেষ করে কংগ্রেসী মহল থেকে দেশের শত্রুদের প্রতি 'সহনশীল মনোভাব' দেখিয়ে 'হাজার হোক ওরা তো দেশেরই লোক' মার্কা যে আওয়াজ তোলার চেষ্টা হচ্ছিল তাকেও নস্যাৎ করে দিল এই আলোচনা চক্র। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্তমান ও নিবর্তমান দুই সরসঙ্ঘচালক—মোহন ভাগবত ও কে এস সুদর্শন যে চোখ দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দর্শন করালেন, তাতে দেশবাসী নিরাপত্তার আশ্বাসটুকু অন্তত যে পেলেন তা বলাই বাহুল্য। সঙ্গে

সভায় উপস্থিত সুদর্শনজী, মোহনজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বাড়তি পাওনা ইন্দ্রেশ কুমার, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক, লোকসভার ডেপুটি স্পীকার কারিয়া মুণ্ডা, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম কুমার ধূমল, বিজেপির বর্ষীয়ান নেত্রী নাজমা হেপাতুল্লা-র মতো ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি। অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হাজির সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ছ'শো-রও বেশি ব্যক্তিত্ব। কে নেই তাতে? সশস্ত্র বাহিনী,

(এরপর ৪ পাতায়)

মহিলাদের অধিকার হরণের ষড়যন্ত্র জম্মুতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে চাপান-উতোরের মাঝেই বিশেষ করে জম্মুর মহিলাদের, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত হচ্ছে—এমনই অভিযোগ উঠল। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে 'স্থায়ী বাসস্থান (যোগ্যতাহীন)' শীর্ষক একটি বিল। যাতে বলা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের মহিলারা যদি রাজ্যের বাইরে অন্যত্র বিবাহ করেন তবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের তাদের কোনও সম্পত্তিতে (এমনকী পৈতৃক হলেও) সেই অধিকার আর থাকবে না। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, আইনটি রচিত হবার সময় স্রেফ কাশ্মীরি মহিলাদের (যাদের প্রায় সবাই মুসলিম) অধিকারকে সুরক্ষিত করার কথাই ভাবা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে জম্মুর মহিলাদের (যাঁরা অধিকাংশই হিন্দু) ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রও করা হয়েছে। কারণ কাশ্মীরের মুসলিম রমণীদের বিবাহ সাধারণত নিজের পরিবার বা নিদেনপক্ষে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই

সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেই আত্মীয়-স্বজনরাও যে মূলত কাশ্মীরেরই বাসিন্দা তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে কাশ্মীরের মেয়েদের কাশ্মীরের বাইরে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা একপ্রকার নেই বললেই চলে। কিন্তু জম্মুর পরিস্থিতিটা কিছুটা আলাদা। সেখানকার হিন্দু মেয়েদের বিবাহ নিজেদের পরিবারের মধ্যে সম্পন্ন হবার তো কোনও প্রশ্নই নেই। আর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হলেও, সেই আত্মীয়-স্বজনরা যে রাজ্যের বাইরের বাসিন্দা হতেই পারেন অন্তত বেশ কিছু ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গিয়েছে। কূটনৈতিক স্তরে তাই মনে করা হচ্ছে, সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত জম্মুবাসীকে ভয় দেখিয়ে ঘর ছাড়া করার পাশাপাশি, আইনসিদ্ধ ভাবেও তাদের উৎখাত করার জন্য এহেন কালা-কানুন পাশ হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভায়।

২০০৪ সালে মুফতি মহম্মদ সঈদের সংযুক্ত (কোয়ালিশন) সরকার এরকমই বিল আনতে চেয়েছিল বিধানসভায়। দেশজুড়ে এর স্বপক্ষে একটা হাওয়া তোলবার চেষ্টাও হয়েছিল তখন। কিন্তু আপাতত সংসদের উচ্চ কক্ষেই বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যায়। সেই সময় পিওপিলস'

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

জাতীয় সুরক্ষা সুরক্ষিত হোক

ব্রজেশ মিশ্র

১৯৬২ সালের চৈনিক আগ্রাসনের পর এই প্রথম ভারতকে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এক চরম কঠোর ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। ১৯৬২ থেকে আমাদের দেশকে দেশের দুই প্রান্ত— উত্তর ও পশ্চিম ফ্রন্টের শত্রুশক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে (পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশ সমস্যার সৃষ্টি করলেও তা সামলানো গেছে)। সৌভাগ্যবশত, আজ পর্যন্ত যুগপৎ উত্তর ও পশ্চিম ফ্রন্ট একসঙ্গে সক্রিয় হয়নি। কিন্তু বর্তমানে চীন ও পাকিস্তান একযোগে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে এবং ভারতকে বিশ্বের সামরিকক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয় হতে দিচ্ছে না।

চীনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার ওপর আগ্রাসী মনোভাব ভারতকে আর একবার টুকরো করার দুরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনা যুগিয়ে যুদ্ধে জড়াতে চাইছে। ইতিমধ্যেই এমন ঘটনার নজির মিলেছে। চীন জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটকদের আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ভিসা ইস্যু করছে। শুধুমাত্র ভারতীয় পাসপোর্টের ওপরই নয়। চীন ক্রমাগত পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র যুগিয়ে চলেছে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অক্টোবর ২০০১ থেকে পাকিস্তানকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে)। এরই বলে বলীয়ান পাকিস্তান ২০০৩ সালে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, সেই সীমা দিয়েই অনুপ্রবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, আন্তর্জাতিক সীমা বরাবর বাঙ্কারও বানিয়েছে। এবং অবশ্যই বিরামহীনভাবে সেদেশের মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা শুধু জম্মু-কাশ্মীরেই নয় বরং সারাদেশেই নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ওই দুই ফ্রন্ট যুগপৎ সক্রিয়। ১৯৭১ সালে আমাদের মদত দিয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু বর্তমানে যদি একান্তই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে তবে আমাদের হয়ে কেউ এগিয়ে আসবে না। চীনের সঙ্গে হলে তো অবস্থা আরও করুণ।

দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে ভয়াবহ হলো বাইরের জঙ্গিদের এদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে যোগসাজশে নাশকতা চালিয়ে যাওয়া। এটা শুধুমাত্র পাকিস্তানের কাছ থেকে মদত নিয়েই সম্ভব নয়। বহু বছর ধরে উত্তর-পূর্ব প্রান্তের জঙ্গিরা চীনের কাছ থেকে নানাবিধ সাহায্য পেয়ে এসেছে এবং চীন মায়ানমারের বিদ্রোহীদের কাজে লাগিয়েছে। আবার সম্প্রতি কোবাড ঘ্যাণ্ডি-র বিরুদ্ধে চার্জশীটে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ভারতে আশ্রয়ে নেওয়া মাওবাদীরা নেপাল সহ অন্যান্য দেশের সমমনোভাবাপন্ন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সুতরাং দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড এবং বাইরের দেশের সন্ত্রাসবাদীদের যোগসাজশ-কে আমাদের আর অবজ্ঞা করলে চলবে না।

ভারত সরকারের জরুরী কাজ হলো শক্ত হাতে এইসব বিরোধী জঙ্গিশক্তিকে দমন করতে উদ্যোগী হওয়া। প্রথমে আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে বৃদ্ধি করে বহিঃশত্রু চীন ও পাকিস্তানের বৈরিতাকে কড়া হাতে মোকাবিলা করতে হবে এবং এইজন্য প্রয়োজন হলো আমাদের তিন বাহিনীকে অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রসম্ভার দিয়ে সুসজ্জিত করা। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বোফর্স কেলেঙ্কারির যাবতীয় অভিযোগের উর্দ্ধে উঠে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য আধুনিকতম সমরসম্ভার ক্রয় করে পুরাতন কাঠামোকে নতুন করে সুসজ্জিত করতে হবে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রক্রিয়া চলে তাতে কেবল অনাবশ্যক বিলম্ব-ই হয় না, উপরন্তু এইসব পদ্ধতি দুর্নীতির জন্ম দেয়। একটা সোজাসাপ্টা উদাহরণ দিই। বর্তমানে দেশের মানুষ পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে। কারণ অপরাধীরা দেশের আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের আর সমীহ করছে না। আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সংস্কার না হলে তা অচিরেই মানুষের আস্থা হারাবে। কীভাবে এক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাহিনীকে নিম্ন মানের জুতো, পোষাক দিয়ে সিয়াচীনের মতো দুর্গম অঞ্চলে পাঠানো হয়?

দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা বিভাগকেও ঢেলে সাজাতে হবে। এদের শুধু দেশের বাইরের শত্রুদের খোঁজ খবর নিলে চলবে না, দেশের অভ্যন্তরে যে সুসংগঠিত সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড চলছে তার সুলুক সন্ধান করে খুঁটিনাটি তথ্য সরকারকে দিতে হবে। এর অর্থ হলো দেশের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও অর্থদপ্তরের মধ্যে চাই নিবিড় সমন্বয়। আবার স্পাই স্যাটেলাইটের মতো আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে গোয়েন্দাদের আরও তৎপর হতে হবে।

তৃতীয় কাজ হলো প্রতিটি রাজ্যে পুলিশি সংস্কার প্রয়োজন। আগাগোড়া পুলিশি নিয়োগ, তাদের বদলি সহ পদোন্নতির বিষয়গুলিতে কোনওভাবেই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলবে না। পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ একেবারে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। একেবারে দক্ষ পুলিশদের প্রতিটি রাস্তায় ডিউটির ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলেই জঙ্গি ষড়যন্ত্র এবং বিভিন্ন অপরাধীদের কর্মতৎপরতা বিষয়ে বাহিনী সজাগ থাকবে।

আমার সর্বশেষ অভিমত হলো আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ বিষয়ে। আমাদের নোংরা রাজনীতি প্রায়শই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই অপরাধীদের নির্বাচনে প্রার্থী করে এবং বিবেচনা করে না যে এইসব অপরাধীরা দেশের ঐক্যের পক্ষে বিপজ্জনক। এরজন্য কোনও উদাহরণের দরকার নেই। কেননা এইসব প্রথা চলে আসছে পঞ্চায়েত থেকে সংসদীয় নির্বাচন পর্যন্ত। এর পরিণাম হলো গণতন্ত্রের সমাধি, যা দেশের সংহতির পক্ষে ভয়ানক। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতারা কী আদৌ এসব ব্যাপারকে তোয়াক্কা করেন?

লেখক প্রাক্তন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার।

সৌজন্যে—পাইওনীয়ার

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল

শেষ পর্যন্ত পরমাণু দায়বদ্ধ তা (সিভিল লায়াবিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ) বিলটি লইয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইল মনমোহন সিং সরকার। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ও বামদলগুলি যে বিলটির বিরোধিতা করিবেই ইহা সরকারের অজানা ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ইচ্ছা ছিল তাঁহার ওয়াশিংটন সফরের আগেই যাতে বিলটি সংসদে পাশ হইয়া যায়। লোকসভার কার্য বিবরণীতেও বিলটির উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইউ পি এ-র যথেষ্ঠ সংখ্যক সাংসদদের লোকসভায় অনুপস্থিতি এবং সরকারের অভ্যন্তরে মতবিরোধের কারণে বিলটি পেশ করা হইল না।

এই বিলে বলা হইয়াছে, পরমাণু কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটিলে বিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থাকে ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কেন এত কম টাকা দিয়া বিদেশী সংস্থা ছাড় পাইয়া যাইবে। আমেরিকায় যেখানে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ১২৫০ কোটি ডলার (প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা), সেখানে প্রস্তাবিত বিলে সর্বোচ্চ ২২০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের কথা বলা হইয়াছে। যাহার মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা দিবে বিদেশী সংস্থাগুলি। বাকিটা দিতে হইবে ভারত সরকারকেই। চুল্লির প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে এবং ইহার ফলে সাধারণ মানুষের যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহার দায় মার্কিন চুল্লি সরবরাহকারীরা লইবে না। দায় বহন করিতে হইবে ভারত সরকারকেই। এইভাবে ভারতের সাধারণ মানুষের করের টাকায় ইউপিএ সরকার আমেরিকার বহুজাতিক পরমাণু রসদ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলিকে ভর্তুকি দেওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করিতেছে এবং আমেরিকার চাপেই মনমোহন সিং সরকার ইহা করিতেছে।

পঁচিশ বছর আগে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কথা সকলেরই স্মরণে রহিয়াছে। বহুজাতিক ইউনিয়ন কার্বাইড ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়াছিল একুশ শো বাহান্ন কোটি টাকা। যদিও ক্ষতির পরিমাণ ছিল তাহার অনেক গুণ বেশি। তেমনই রাশিয়ায় চেরনোবিলে পরমাণু চুল্লি দুর্ঘটনার কথাও অজানা নহে। পরমাণু চুল্লিতে সর্বাধিক সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিলেও দুর্ঘটনা হইবে না এমন কথা বলা যাইবে না। তাহা ছাড়া পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনা আর পাঁচটা শিল্প দুর্ঘটনার মতো নহে। এখানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে মানবদেহে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হইতে পারে। তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও সম্পদের ক্ষতির পরে বছরের পর বছর ধরিয়া সেই ক্ষতি অব্যাহতই থাকে। তাই এইক্ষেত্রে দায়বদ্ধ তা সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু মার্কিন সরকার ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলি দাবি করিতেছে এই দায় হইতে তাহাদের রেহাই দিতে হইবে।

বিশেষজ্ঞদের তথ্যানুযায়ী পরমাণু চুল্লিজনিত ক্ষতির দায়বদ্ধ তা সম্পর্কে ভিয়েনা কনভেনশনে নির্দিষ্ট কথা বলা হইয়াছে। সেখানে উর্ধ্বসীমা বাধিয়া দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। জার্মানি, জাপান বা ফিনল্যান্ডের মতো দেশে উর্ধ্বসীমা নাই। অন্যদিকে মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশে পরমাণু চুল্লি সরবরাহকারী বহুজাতিকদের থেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি অগ্রিম জমা রাখিয়াছে। অথচ কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার ক্ষতিপূরণে মাত্র একুশ শো কোটি টাকার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিতে চলিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়া বা ফ্রান্সের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা থাকিলেও এই দেশগুলি আইনের জন্য চাপ দেয় নাই। দিয়াছে মার্কিন প্রশাসন। দুর্ঘটনার উর্ধ্বসীমা স্থির করিবার নীতি, পরমাণু চুল্লির যন্ত্রাংশ সরবরাহকারীকে ছাড়, প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা, দেশের বিচারব্যবস্থা নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের দায়সংক্রান্ত নীতি লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলি তাই আলোচনার দাবি রাখে। পরমাণু চুল্লির ভুল-ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনায় যে জীবন ও সম্পত্তিহানি হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ চুল্লি নির্মাতাদের বদলে ভারত সরকার অর্থাৎ ভারতের করদাতাদের বহন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই বিল গৃহীত হইলে সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইতেছে। এই বিল তাই যে কোনও দায়িত্বশীল নাগরিকই সমর্থন করিতে পারে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যে স্বাধীন ভারতে অজেয় বীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অপ্রতিহত গতি বিরাট বাহিনী কেবল দেশরক্ষা করিত না, দিগ্বিজয়ে বাহির হইত, যে ভারতের সীমা প্রাগজ্যোতিষপুর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সম্রাট অশোকের বলশালী বাহু যাহাকে সংগঠিত করিয়া জগতের সকল দেশের ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর "স্বাধীন" ভারত তাহা হইতে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছে, তাহা ভারতের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। তাহারা বেদনা ভরা চিত্তে ইহাই অনুভব করিবেন যে, এ ভারত চন্দ্রগুপ্ত অশোকের ভারত নহে, হর্ষবধন শিলাদিত্যের নহে, মারাঠা কেশরী বাজীরাও-এর ভারত নহে, এই ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতাদের নিজের দেশের ধর্ম তো দূরের কথা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আর্দশে বিশ্বাস নাই। আত্মবিশ্বাসহীন-আত্মনির্ভরতা শূন্য মেরুদণ্ড হীন বৈদেশিক নীতির অনুসরণকারী ভারত এশিয়ার নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্ন থাকিবে। প্রত্যেক রাষ্ট্র শক্তি নির্ভর করে উহার মানুষগুলির উপর। রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সুসংগঠিত জাতিতে পরিণত করিলে উহাই হয় রাষ্ট্রের শক্তি ও সমৃদ্ধি র ভিত্তি। ভারতে সেভাবে জাতি গঠনের চেষ্টা বৃটিশ রাজত্বে না হইবার কথা। কিন্তু ভারতের চরম দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও সে কাজ আরম্ভ হয় নাই। শুধু তাহাই নহে, রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা তো সে কাজ করিবেনই না, "সেকুলার" সাজিবার অতিরিক্ত আগ্রহে জনসাধারণকেও তাহা করিতে দিবেন না।

—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্বাঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের ডাক

গোপীনাথ দে

এবারের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশে কৃষির ফলন বাড়াতে পশ্চি মবঙ্গসহ পূর্বাঞ্চ লের রাজ্যগুলিতে সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণের ডাক দিয়ে ৪০০ কোটি (চারশত কোটি) টাকা বরাদ্দ করেছেন। যে সব রাজ্যগুলির জন্য ওই টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেগুলি হলো—পশ্চি মবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং উত্তর প্রদেশের পূর্ব এলাকা। অর্থাৎ ছয়টি রাজ্যের জন্য মোট ৪০০ কোটি টাকা মাত্র। প্রতি রাজ্যের জন্য একশ' কোটিও নয়। তাই যদি হয় তবে বলতে হয় এটি একটি বিশুদ্ধ প্রগতিশীল রসাল তামাশা। আর একটি বাজেটের উদাহরণ দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল বাজেটে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের আধুনিকীকরণের পর সেখানে উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের ২০০ ইউনিট থেকে বাড়িয়ে ২৭৫ ইউনিট করার কথা ঘোষণা করেছেন এবং এজন্য প্রস্তাবিত খরচ ১৩০ কোটি টাকা। কিন্তু রেলমন্ত্রী বরাদ্দ করেছেন মাত্র ৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ওই প্রকল্পের জন্য শিলান্যাস করতে গেলেই ওই বরাদ্দ টাকাটা খরচ হয়ে যাবে এবং পরের বছর তিনি ওই দপ্তরের দায়িত্বে থাকবেন কিনা বা থাকলেও ওনার বাজেটে ঐ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখবেন কিনা বা রাখলে কত রাখবেন তা কে জানে? একথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে গতবারের বাজেটে ডানকুনি ও মাঝেরহাটে রেল ভিত্তিক গুচ্ছ শিল্প প্রকল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এবারের বাজেটের প্রস্তাবে মাঝেরহাটের নাম বাদ। সেই কারণে এই ধরনের বাজেটকে যদি বিশুদ্ধ ধাপ্পা বলা হয় তবে কি খুব অন্যায় হবে?

কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের দুটি প্রধান স্তম্ভ হলো উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং যথাযথ মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক-এর ব্যবহার। সঙ্গে উপযুক্ত সেচ, কৃষকের প্রশিক্ষণ ও মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি। এগুলির ব্যবস্থার কথা কি প্রণববাবু ভেবেছেন? প্রথমে পশ্চি মবঙ্গের কথাই ভাবা যাক— পশ্চি মবঙ্গের হুগলী জেলায় চুঁচুড়ায় একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ধান্য গবেষণা কেন্দ্র আছে। এবং এই কেন্দ্রে দক্ষ গবেষকও আছেন। কিন্তু গবেষকদের কাজে লাগান দূরের কথা—এই কেন্দ্রের জমি দখল করে মহিলা পলিটেকনিক কলেজ, কোঅর্ডিনেশন কমিটি ভবন, বাঙলা আধুনিক কবিতা -উপন্যাসে যৌনতা বিষয়ক আলোচনা ভবন আরও কত কি হচ্ছে। অথচ গবেষকদের কাজে লাগালে বা গবেষকরা সুযোগ-সুবিধা পেলে রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল গোবিন্দভোগ, এমনকী সংকর ধান বিকাশ করতে পারেন। একইভাবে, পাহাড়ে বিকশিত হতে পারে ধসারোধী আলু (বীজ) এবং বহরমপুরে কীট অবরোধী ডাল হতে পারে—যদি পরিকল্পনা ও দিশা থাকে। এই পরিকল্পনা ও দিশা কি প্রণববাবু তাঁর বাজেটে দেখাতে পেরেছেন বা সেরূপ পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন? বরং উল্টোটা বলা যায় এবারের আলুর বাজার দেখে। প্রণববাবু সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণ চান ভারতের পূর্বাঞ্চ লের ছটি রাজ্যে;উৎপাদন বৃদ্ধি র জন্য। কিন্তু প্রণববাবুর এই কথা বাজেটে বলার আগেই পশ্চি মবঙ্গে র চাষিরা এবার রেকর্ড পরিমাণ আলু উৎপাদন করেছেন। যা সরকারি হিসাবে প্রায় ৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু পশ্চি মবঙ্গে চাষিরা এই রেকর্ড পরিমাণ আলু উৎপন্ন করে বিপদে পড়েছেন। তাঁরা দাম পাচ্ছেন না বা তাঁরা উৎপাদন মূল্যটুকুও পাচ্ছেন না। যার ফলে চাষিরা বা উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন;ধারদেনা শোধ করতে পারবেন না যার পরিণতিতে আত্মহত্যাও হতে পারে। তাই চাষিদের কাছে অধিক ফলনটা এখন বিষময় হয়ে উঠেছে। এর জবাব প্রণববাবু কি দেবেন?

আলু সংরক্ষণের জন্য রাজ্যে এখন মোট ৪১৭টি হিমঘর আছে। যেগুলিতে মোট ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন আলু রাখা যেতে পারে। রাজ্যে বছরে সর্বমোট প্রায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু প্রয়োজন। অর্থাৎ রাজ্যের সব প্রয়োজনটুকু মেটাবার মতো আলু রাখার হিমঘর পশ্চি মবঙ্গে নাই।

গত বছর নাবিধসা রোগে আলুর গাছনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই ফলন অনেক কম হয়েছিল;প্রায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এবং অনেক কৃষকই এই কারণে কৃষি বিমার জন্য টাকা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন! কিন্তু কৃষকরা যথাযথ সময়ে কৃষি বিমার টাকা কি পেয়েছেন? জবাব তো প্রণববাবুকেই দিতে হবে এবং সেজন্য কি ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা তাঁকেই বলতে হবে।

পাঞ্জাব-হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লব হয়েছিল কারণ সেখানে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করেছিল এবং উৎসাহিত করেছিল। সরকার থেকে সেখানে উচ্চ ফলনশীল বীজ দিয়েছিল এবং উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করেছিল। সেচের জন্য কৃষকের জমিতে জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে সরকার প্রদত্ত সেচের জলের জন্য কৃষককে কোনও জলকর দিতে হয় না। যেসব এলাকায় সরকার সেচের জন্য জল দিতে পারে না;কৃষককে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করে ফসল ফলাতে হয়, পাম্প সেট চালিয়ে সেচের জল সংগ্রহ করতে হয়। সেক্ষেত্রে মটর চালিত পাম্পসেটের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরকার দেয়। পশ্চি মবঙ্গে যা কল্পনারও বাইরে। আজও পশ্চি মবঙ্গে ষাট শতাংশেরও বেশি কৃষিজমি সেচের আওতার বাইরে; বৃষ্টি নির্ভর একফসলা জমি যদি পাঞ্জাবের মতো পশ্চি মবঙ্গের সব কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনা যেত বা দ্বি-ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা যেত তবে পশ্চি মবঙ্গে ও আশাতীত সবুজবিপ্লব অনায়াসেই সম্ভব হোত। সেদিকের কথা চিন্তা করে প্রণববাবু বাজেটে কোনও বরাদ্দ রেখেছেন কি? সমগ্র পশ্চি মবঙ্গে ছোট বড় খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, জলাশয় মিলে সর্বমোট প্রায় এগার লক্ষ জলাশয় আছে। এগুলি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় অনেকাংশে পলিমাটিতে ভরাট হয়ে গিয়েছে। এগুলি যথাযথ সংস্কার করলে এইসব জলাশয়গুলি জল ধারণ ক্ষমতা অনেক বাড়বে এবং ক্ষুদ্রসেচের সুবিধা হবে। কৃষকরা নিজ নিজ উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা করে এক ফসলী জমিকে দু-ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করে নিতে পারবে। এবং ওই সংস্কার হওয়া জলাশয়গুলিতে মাছ চাষের সুযোগ বাড়বে। এবং ওই জলাশয় থেকে সংস্কারের সময় যে মাটি বা পাঁক তোলা হবে সেটা যেখানেই পড়ুক—জমিতে পড়লে জমি উর্বর হবে; কোনও গাছের গোড়ায় পড়লে সেই গাছও ভাল ও সতেজ হবে। এইসব জলাশয়গুলির সংস্কারের জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের বা পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়নি। সবুজ বিপ্লবের জন্য এটা জরুরী।

ডি, ভি, সি প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাথ সাহা বলেছিলেন ডি, ভি, সি পরিকল্পনাটা মাত্র ৫০ বৎসরের জন্য; তারপর ডি, ভি, সি-র পরিকল্পনা অকেজো হয়ে পড়বে। বাস্তবে তাই হতে চলেছে। ডি, ভি, সি-র বয়স কবে ৫০ বৎসর পার হয়ে গেছে এবং জলাধারগুলি পলি জমে প্রায় আশি শতাংশের উপর ভরাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য ডি, ভি, সি-র জলাধার গুলির জল ধারণ ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কি করে সম্ভব? ডি ভি সি-র ওই সব জলাধারগুলি থেকে জমা পলি সরালে জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে এবং সেচের জন্য জল আরও বেশী বেশী জমিতে দিতে পারবে। ফলে সবুজ বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। আর ওই অপসারিত পলি, লাল কাঁকুরে বা পাথুরে অকৃষি জমির উপর তিনফুট উচ্চতায়

(এরপর ৪ পাতায়)

> "পশ্চি মবঙ্গসহ পূর্বাঞ্চ লের রাজ্যগুলিতে সবুজ বিপ্লবের সম্প্রসারণের ডাক দিয়ে ৪০০ কোটি (চারশত কোটি) টাকা বরাদ্দ করেছেন। যে সব রাজ্যগুলির জন্য ওই টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেগুলি হলো—পশ্চি মবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড , ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং উত্তর প্রদেশের পূর্ব এলাকা। অর্থাৎ ছয়টি রাজ্যের জন্য মোট ৪০০ কোটি টাকা মাত্র। প্রতি রাজ্যের জন্য একশ' কোটিও নয়। তাই যদি হয় তবে বলতে হয় এটি একটি বিশুদ্ধ প্রগতিশীল রসাল তামাশা।"

মুসলিম সংরক্ষণ : সংশয়ের কাঁটা

(১পাতার পর)

থেকে উদ্ধৃতি দিলে উত্তরটা সহজ হবে।

"The West Bengal Government's announcement of a 10 per cent quota for Muslim in State Government job, a year ahead of election falls in the category" সম্পাদকীয় স্তম্ভের সবার উপরে নেহরুর সে বাণীটি দেওয়া আছে এ ব্যাপারে তাও লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন 'I dislike any kind of reservation.' তারপর সম্পাদকীয় বিষয়ের উল্লেখ—'High court striks down reservation for Muslims in Andhra Pradesh.'

অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্ট মুসলিম সংরক্ষণ বিষয়টি খারিজ করেছে। রায়ে অন্যান্য কারণের সঙ্গে বলা হয়েছে 'Religion specific reservation could encourage conver-sions.'

এরপরে মুসলিমদের একটু সচেতন ভাবে ভাবনা করার প্রয়োজন আছে। মুসলিম হলে তার বিচার শক্তি হারিয়ে যায়? তাঁরা কি বুঝতে পারেন না কে কাজের, কে কাজের নয়? যদি সুবিধা প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি হয় তবে মুসলমান সমাজটাকেই কি সুবিধাভোগী বলা চলে? সত্যিই কি মুসলমান মাত্রই কেবল নিজের সুবিধাটুকু দেখে থাকে? যদি তা না হয় তবে সংখ্যালঘু বলতে তো আরও অনেকেই আছেন তাদের উল্লেখ নাই কেন? মুসলমানদের উপর এমন ধারণা সরকার পক্ষের কেন হলো? মাইনরিটি শব্দটির যে অর্থে নাবালকত্ব বোঝায় সরকার পক্ষ কি মুসলিমদের সেই অর্থে নাবালক ভেবেছেন? এতসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যারা পিছিয়ে আছে তাদের উঠিয়ে নিয়ে আসতে, কেবল কমিশন গড়া হয়েছে, কমিশনের নির্দেশিত পথে অনুন্নতকে উন্নত করতে গিয়ে উন্নতরা আরও উন্নত হয়েছে। পিছিয়ে পড়ারা পিছিয়েই থেকে গেছে। ১৯৮০-র মণ্ডল কমিশন থেকে শুরু করে, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন, সবশেষে সাচার কমিশন যা মাত্র ২০০৭ সালের আগস্টে প্রকাশিত হল। কেন্দ্রে তখন ইউপিএ সরকার। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পনের দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়ে গেল। উদ্দেশ্য যাতে পিছিয়ে পড়ারা এগিয়ে আসে। কিন্তু মানুষ সবিস্ময়ে দেখল, রাজিন্দর সাচার মহোদয় তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন কেবল মুসলিমদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থানকে জোরদার করতে। কারণ একটা ছিল। অনুমান করা যায় এই ভাবে—ইউপিএ-র বামপ্রীতি তখন ভারি হয়ে উঠেছে, ২০০৯ এর জুনে লোকসভা নির্বাচন। ওদিকে প্রতিপক্ষ বিজেপি মোটেই দুর্বল নয়। আবার ওই বিজেপি-কে হিন্দুত্ববাদী বলে প্রচার করে কিছুটা ফল পাওয়া গিয়েছে। অতএব ধর্মপ্রিয় মুসলিমদের নিজের কাজে লাগাতে হলে ওদের সামনেই উন্নয়নের খুড়োর কল তুলে ধরো, তাই হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক শপথকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সবাই লেগেছে মুসলিম উন্নতি করতে।

মজার কথা হলো মুসলমানদের আর্থিক সামাজিক জীবন বৈচিত্র্য সমীক্ষণ করার জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হয়েছে। তার একটির কাজ মুসলমানদের জীবনযাত্রার Diversity Index তৈরি করা। অনেক পণ্ডিত মুসলমানকে এর অর্থ কি জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পাইনি। যতদূর জানি এই কমিটিগুলি এখনও কোনও রিপোর্ট পেশ করেনি। করলেও প্রকাশিত হয়নি। কেবল নির্বাচন সামনে বলেই ধর্মছাড়া বুদ্ধ দেববাবু রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির অপ্রচলিত শর্ত তুলে ধরে মুসলমানদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ ফতোয়া জারি করেছেন।

ফাঁপরে পড়েছে মহাকরণ। আরও ভীমজালে পড়েছেন ওই দপ্তরের মন্ত্রী যোগেশ বর্মন। তাঁরা এই তালিকা তৈরি করতে পারছেন না। সঠিক তালিকা কোনদিন করা যাবে না। কারণ ৭ শতাংশ ও বি সি-র সুযোগ যে বারো গোষ্ঠীর মুসলিমরা পাচ্ছেন, কেবলমাত্র দশ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণে সেই ও বি সি-রাও তো যুক্ত হবে। অতএব বিষয়টি বড় জটিল। জটিল কোনও অংক তুলে ধরতে না পারলে আগামী নির্বাচন পার হবে কি করে?

সবশেষে একটা কথা অবশ্যই বলতে হবে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার জন্য বেশকিছু পরিমাণ দায়ী মুসলমানই। এই ধর্মের শক্তিশালী একাংশ সর্বভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে মুসলমান শিক্ষার্থীকে যুক্ত হতে দিতে চায় না। শিক্ষা প্রসারের জন্য স্কুল খুলতে চাইলে, দাবী ওঠে মাদ্রাসা খোলার। আপামর অমুসলমান ভারতীয় যা শিখে বা তাদের যা শেখান হয়, মুসলমান শিক্ষার্থীকে তার থেকে দূরে রাখতে চান তাঁরা। যদিও এটা প্রাসঙ্গিক আলোচনা নয় তবু একটা উদাহরণ তুলে দিই। সরকারি বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন যখন শুরু হয় তার মধ্যে সম্প্রদায়গত ধর্মশিক্ষার কোনও স্থান নাই। কিন্তু সরকারী মাদ্রাসায় একটি শিশু অক্ষর পরিচয় করছে এই রকম—

অ	অজু করে পড়ি কালাম
আ	আল্লাহ্ মহান নাম
ই	ইমামের কথা চলব মেনে
ঈ	ঈদে মিলব সবার সনে

সমস্ত বর্ণপরিচয়টাই ধর্মাচরণের নির্দেশে ভরা। শিশুমন শৈশব থেকেই একটা শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা করে। যেখানে দাঁড়িয়ে সে জীবন যাত্রাকে মসৃণ করতে পারবে। কিন্তু ধর্ম কেন্দ্রিক এই শিক্ষা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাকে পিছিয়ে দেয়।

একটা দেশ উন্নত হয়, সেই দেশের দক্ষ বিদ্বান শক্তিশালী বুদ্ধি দীপ্ত মানুষের সহায়তায়। কেবল মাত্র সম্প্রদায়গত ধর্মাচরণ করলেই দেশের কল্যাণ হবে এটা ভাবনা করলেই ভয় হয়।

সবচেয়ে বড় কথা সংরক্ষণে নাগরিকত্বের ভেদ ঘটে। গণতন্ত্রে বিশেষত সংবিধান অনুসারি ভারতীয় গণতন্ত্রে সংরক্ষণ কখনই কাম্য নয়। স্বাধীনতার অর্দ্ধশতাব্দী কবে পার হয়ে গেছে, এখনও সংরক্ষণকে ধরে রাখার অর্থই হলো দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

সবুজ বিপ্লবের ডাক

(৩ পাতার পর)

বিছিয়ে দিলে অকৃষি জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা যাবে। ফলে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং রাজ্যের স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে। আমাদের রাজ্যে প্রায় আড়াইশো-র মতো বীজ খামার (সিড ফার্ম) আছে। পশ্চি মবঙ্গ সরকার এগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এক একটি খামারে কমপক্ষে পঞ্চা শ বিঘা কৃষি জমি আছে। এগুলির প্রধান কাজ উন্নতমানের বীজ উৎপন্ন করে কৃষকদের দেওয়া। একসময় সরকার এগুলির বিষয় বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন এবং কমিশনকে বিস্তারিত অনুসন্ধানের পর রিপোর্ট দিতে বলেন। রিপোর্টে কমিশন একস্থানে বলেছেন—"বীজখামারগুলিতে ঘাস চাষ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ে না।" অথচ সবুজ বিপ্লবের জন্য, উন্নত বীজ সরবরাহের জন্য এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এইসব বীজখামারগুলি প্রধান হাতিয়ার হতে পারত। প্রণববাবু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়ে বাজেটে এইসব বীজ খামারগুলি সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। পৃথিবী ব্যাপী সবুজ বিপ্লবে যেভাবে কৃষিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে উৎপন্ন শস্যের বা সবজির মাধ্যমে মানবদেহে যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা দেখে সবুজ বিপ্লবের জনক-নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ শেষ জীবনে বলেছিলেন—"সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে নূতন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।" বর্তমানে বিটি বেগুন নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে উচ্চ ফলনশীল শস্য ও সবজী উৎপন্ন করা হচ্ছে ঠিকই—মানুষের ক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা আরও বেশকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে এইসব শস্য ও সবজীর ছাড়পত্র দেওয়া উচিৎ নয়।

শত্রুদের চিহ্নিত করতে হবে

(১পাতার পর)

প্যারামিলিটারি বাহিনী, সাধারণ পুলিশ, গোয়েন্দাবাহিনী, প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তি (ব্যুরোক্র্যাট)-রা যেমন আছেন, তেমনি আছেন আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও সমাজসেবী মানুষেরা। দু'দিনের এই আলোচনা চক্রে সীমাপারের সন্ত্রাস, উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, হিমালয় রক্ষা ও জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়।

গোয়েন্দাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান অজিত দোভাল মন্তব্য করেছেন, "শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই-এ সফল হলাম কিনা, সেটা শুধুমাত্র জয়-পরাজয় দ্বারাই নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক কর্তব্য শত্রুদের আগে চিহ্নিত করা এবং তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 'ভাষা'টা বোঝার চেষ্টা করা। তারপর রণকৌশল স্থির করা। তবেই আমরা শত্রুদের 'প্রকৃত পরাজয়' ঘটাতে পারব।" তবে দোভালের পরবর্তী মন্তব্যটা 'বাটালা-বিরুদ্ধ বাদীদের' অস্বস্তিতে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর বক্তব্য—'অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া কখনও কখনও দেশের শত্রুদের উৎসাহিত করে, অন্যদিকে দেশবাসীর মনোবলেও এর ফলে চিড় ধরে।'

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল সরাসরিই চাইছেন সর্বপ্রথম দেশের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের চিহ্নিত করতে এবং অনতিবিলম্বে তাদের এদেশ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিতে।

সম্মেলনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্ররাও উপস্থিত ছিলেন। অবধেশানন্দ গিরি মহারাজ, জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর দেশের সুরক্ষার জন্য দাওয়াই দিলেন—এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির 'রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা আগে বাড়ান দরকার। কারণ কখনও কখনও 'রাজনৈতিক আগ্রহ' জাতীয় সংহতির আগে স্থান পায় (ওঁদের ভাষায় ডমিনেট করে)।

অজিত দোভাল সহ অন্যান্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ যেমন অনিল কাকোদকর (ডি এ ই-এর প্রাক্তন সচিব), যোগেন্দ্র নারায়ণ (প্রাক্তন নিরাপত্তা সচিব) যা বলে গেলেন তা থেকে স্পষ্ট—আগে ঘরের ভেতরটা সামলাতে হবে, ভেতরটা সামলাতে পারলে তবেই না বাইরের প্রসঙ্গ আসবে!

ব্যাকফুটে বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম

(১পাতার পর)

হলফনামা দিয়েছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনওদিনই আদালতে কোনও মামলা ছিল না। জেনেশুনে অসত্য হলফনামা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করতে এই ত্রয়ী শলাপরামর্শ করে জনৈক পার্টি সমর্থকের বেনামে আলিপুরের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মানহানির মামলা করেন। পরে বুঝতে পারেন, একেবারে কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। কারণ, মামলা শুরু হলে অনেক প্রশ্ন উঠবে। ধরা পড়ে যাবে ছলচাতুরি। এমনকী নিরুপম সেনের নির্বাচনও বাতিল হতে পারে অসত্য হলফনামা দেওয়ার জন্য। গত ১২ মার্চ আলিপুর আদালতে সেই মামলার শুনানী হওয়ার ঠিক আগের দিন গোপনে পিটিশন দিয়ে একতরফাভাবে মামলা তুলে নেওয়া হয়। পার্টির অন্দরমহলে প্রশ্ন উঠেছে, যদি এতই ভয় ছিল বেআব্রু হওয়ার তবে কেন লোক হাসাতে পার্টি মানহানির মামলা দায়ের করেছিল?

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরকম। বৃটিশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরিক হবসবমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সি পি এমের কেন্দ্রীয় নেতা প্রকাশ কারাট স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, আগামী রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে তাঁর দল হারছে। এতে বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম জুটি বেজায় ক্ষিপ্ত। তাঁদের বক্তব্য, পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মশাই সবজান্তার মতো এমন বিরূপ বার্তা দিলে নিচের তলার কর্মীরা মনোবল হারাবে। তাঁরা চাপ দিয়েছিলেন কারাটের ওপর একটি বিবৃতি দিয়ে এরিক হবসবমকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে। কারাট রাজি হননি। ফলে এই ত্রয়ীকে থুথু গিলতে হয়েছে। দলের কর্মীদের কাছে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন। পার্টির কর্মী সমর্থকরা এঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

মহিলাদের অধিকার

(১পাতার পর)

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পি ডি পি) ও তার সহযোগী কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট বিলটির সমর্থনে সরব হয়েছিল। কিন্তু এরপর জম্মুর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ আর দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় কংগ্রেস। সেদিনকার 'কংগ্রেসী সহযোগী' পি ডি পি ও তাদের নেত্রী মেহবুবা মুফতি আজ বিরোধী আসনে বসেও চাইছেন বিলটি পাশ করাতে। এই বিলের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই সংসদে সরব হয়েছে বিজেপি। এর বিরোধিতা করেছে কংগ্রেসও। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে সত্যি, সংসদে যখন মহিলাদের সংরক্ষণ দিয়ে তাদের হাতে ক্ষমতায়নের ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করতে চাইছে, তখন ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্যে নারীদেরই জন্মগত অধিকারটুকুও কেড়ে নেবার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংসদে মহিলা বিল নিয়ে ল্যাজে-গোবরে কংগ্রেস, এনিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে কি ভূমিকা নেয় সেটাই দেখার।

রাজ্য রাজনীতি

কলকাতা জেলা পার্টির আওয়াজ নেতা-নীতি বদলাও, পার্টি বাঁচাও

নিশাকর সোম

গত লেখাতে সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটির বর্ধিত সভার কোনও উল্লেখ করা হয়নি। কারণটা পরে বলছি—এই সভা সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাতে যা বেরিয়েছে তা একান্তই সাধারণ এবং বহুল চর্চিত। এ সম্পর্কে আমাদের 'স্বস্তিকা'তে সবই লেখা বেরিয়েছে। এই সভায় দু'টি দলিল পেশ করা হয়—(১) সাংগঠনিক এবং (২) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সংক্রান্ত।

সাংগঠনিক দলিলের সব কথার মধ্যে নতুন যে কথাটি বেরিয়ে এসেছে যে তা হলো—জেলা কমিটির সদস্যদের মধ্যেও নিস্ক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। তাঁরা যান্ত্রিকভাবে গতানুগতিক কায়দায় কাজ করছেন। দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও জোনাল কমিটি তথা লোকাল কমিটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানা তারা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে দলবাজি বা গোষ্ঠীবাজির ফলে সকল সদস্যের নবীকরণ করা হয়ে গেল।

শুধু লেভি আদায় ও দু'দিনের ওয়েজ আদায়ে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ—টাকাই তো সব। জেলা নেতৃত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে শ্রমিক অঞ্চ লে কাজের জোর দেওয়া হচ্ছে না। পোর্ট-ডক-খিদিরপুর এলাকা অবহেলিত, কারণটা হলো এসব এলাকাতে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়—তাই অবহেলা। ট্রামশ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন প্রলয় দাশগুপ্ত, অপরদিকে স্টেট ট্রান্সপোর্টে পার্টি দুর্বল হয়ে গেছে। স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর কর্মীদের মধ্যে শিবানী সেনগুপ্ত সম্পর্কে ক্ষোভ আছে।

সাংগঠনিক দলিলে আর একটি বিষয় উঠে এসেছে যে পার্টি সভ্যদের মধ্যে একাংশ বিরোধীদল-এর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছেন। স্বস্তিকার পাতায় এটা অনেক আগেই বলা হয়েছে। ২০১১-তে সরকারের পরিবর্তন হলে সিপিএম-এর আসল কঙ্কালটা বেরিয়ে আসবেই। 'ভোটে জেতানোর কর্মী'রা দলে দলে তখনকার সরকারি দলে যাবেন। তাই এখন থেকেই যোগাযোগ রাখছেন। কিছু কর্মী পার্টির ভবিষ্যতে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা সম্পর্কে হতাশ। তাই তাঁরা সংসার ধর্মে, রুজি-রোজগারে মন দিয়েছেন। এই কর্মীরা আগে রুটি-রুজির কথা না-ভেবে, সংসারকে অবহেলা করে পার্টি করেছেন। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জ্যোতি বসুর স্মরণ সভায় রাজ্য সিপিএম-এর সম্পাদক বিমান বসু মন্তব্য করেছেন, "কিছু কমরেড খালি রোজগার করছেন, অথচ জ্যোতি বসু বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা রোজগার না-করে পার্টির হোলটাইমার হয়েছিলেন।" বিমানবাবু এবং অন্যান্য নেতাদের পুত্র-কন্যা-কলত্র- পরিজনরা তো সকলেই রোজগেরে। খালি দরিদ্র নিপীড়িত কর্মীদের পুত্র-কন্যাদের চাকুরির ব্যাপারে বিমানবাবুরা নিরপেক্ষ-স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে। বিমানবাবু কি জানেন না—জ্যোতি বসুকে খাওয়ার জন্য সংসারের খরচের জন্য কোনও চিন্তা করতে হোত না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ কে বা কারা দিতেন? বিমানবাবু জানেন কি শতশত কমরেড জ্যোতি বসু তৈরি করতে গিয়ে সংসার-পরিবার-নিজেকে জীর্ণ-দীর্ণ করেছিলেন। তাঁদের কথা বিমানবাবুরা জানেন না বা তাঁদের কোনও মূল্য দেন না। বিমানবাবু আপনি হোলটাইমার—আপনার বাড়ি থেকে কোনও সাহায্য আসে না। আপনি ফুরফুরে আদ্দির জামা পরেন—আপনি এবং মুখ্যমন্ত্রী বিলিতি সিগারেট খান কি করে? বিমানবাবু জেনে রাখুন— জ্যোতিবাবুকে কোনওদিনই অধিক কষ্টে থাকতে হয়নি। হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িটাতে এক সময়ে ওয়াকার্স পার্টির অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ভাড়াটে ছিলেন। শুধু জ্যোতিবাবু নন, মুজাফ্‌ফর আহমেদ নাকি একসময়ে খাঁটি সাহেবি পোষাক পরতেন এবং "বো" বাঁধতেন? সলিল গাঙ্গুলি কি বলেন? প্রয়াত হরপ্রসাদ চ্যাটার্জির অবদান কি কম ছিল? বিমানবাবু আপনার দেখার সৌভাগ্য হয়নি সাদাসিধে ভবানী সেনগুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, গোপাল ব্যানার্জি, নিত্যানন্দ চৌধুরী, গোপাল আচার্য-দের সাধাসিধে জীবনাচরণ। জ্যোতি বসুর পরম বন্ধু ভূপেশ গুপ্ত তো সমস্ত পারিবারিক সম্পদ ত্যাগ করে একেবারে সাধারণ মানুষ হিসাবে থাকতেন। আজকে জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে অতিশয় উক্তি করে পার্টি কমরেডদের উজ্জীবিত করা যাবে না। জ্যোতিবাবুর প্রয়াণের ফলে তাঁর পুত্রকে কোনও অধিক দুর্গতি ভোগ করতে হবে না। তিনি তো রাজার হালে আছেন। আর নিচের তলার কমরেডের মৃত্যু ঘটলে তাঁর সংসারে অনশন, অর্ধাসন প্রায় ভিক্ষুকের অবস্থা হয়! বিমানবাবুরা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকান না। বিমানবাবু, আপনি জানেন না পার্টির গোড়া পত্তনের যুগে কলকাতায় পাঁচু ব্যানার্জি নামে এক কমরেড পার্টি করতেন। তিনি সরোজ মুখার্জির সমসাময়িক কর্মী ছিলেন। এই পাঁচুবাবুকে "পাঁচুভস্কি" বলে ডাকা হোত। পাঁচুবাবুর জননী লোকের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করে সংসার চালাতেন।

রেলের শতশত কর্মীর ত্যাগের ফলে জ্যোতি বসু প্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন, কেউ না জানুক—মাননীয় সমর মুখার্জি এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু খোঁজ-খবর নিন বিমানবাবু। একদিন তো সমরবাবুই আপনার নেতা ছিলেন। এখন না-হয় আপনি উঠেছেন—তার ফলেই পার্টির অবস্থা এমন হয়েছে। এই কথাও প্রক্ষিপ্তভাবে কলকাতার জেলার সভায় বলেছেন কর্মীরা। বিমানবাবু সম্পর্কে পার্টির বর্ধমান লবির মন্তব্য "একটা এনজিও-এর কর্মী হতে পারার যোগ্য।"

যা'হোক, কলকাতা জেলা সভাতে উপস্থিত করা সাংগঠনিক প্রস্তাবের উপর ব্যাঙ্ক এবং বীমার নেতারা তো নেতৃত্বকে নাড়া দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ছেড়ে কথা বলেনি উত্তর কলকাতা—অলোক মজুমদারকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনার দাবিও উঠেছে। টালিগঞ্জ-যাদবপুরে মনোজপ্রতিম গাঙ্গুলিকে নেতৃত্বে বসানোর দাবি জোরের সঙ্গে তোলা হয়েছে।

এইসব কর্মীরা জেলা নেতৃত্বকে স্থবির বলেছেন—বলেছেন, কলকাতা পার্টি-কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে উদ্দীপিত করতে পারেননি জেলা-সম্পাদকমণ্ডলী। জেলা-সম্পাদক কর্মীদের জি.বি. সভায় বক্তৃতা করলে শ্রোতাদের অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েন।

কলকাতা পুরসভা-সম্পর্কিত ২নং দলিলে পুরসভার 'বহু' কাজের ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে প্রচার করা হয়নি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু পুরসভার এক অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসভার কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন পুরসভায় আজও দালালচক্র সক্রিয়।

"জ্যোতিবাবু সম্বন্ধে অতিশয় উক্তি করে পার্টি কমরেডদের উজ্জীবিত করা যাবে না। জ্যোতিবাবুর প্রয়াণের ফলে তাঁর পুত্রকে কোনও অধিক দুর্গতি ভোগ করতে হবে না। তিনি তো রাজার হালে আছেন। আর নিচের তলার কমরেডের মৃত্যু ঘটলে তাঁর সংসারে অনশন, অর্ধাসন প্রায় ভিক্ষুকের অবস্থা হয়! বিমানবাবুরা তাঁদের দিকে ফিরেও তাকান না।"

অন্য রকম

একমাত্র অটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুম্বাই নিবাসী বছর পঞ্চাশের অনিতা কুদতারকারের কাছে গত ৮ মার্চ দিনটা অন্যান্য কাজের দিনের তুলনায় খানিকটা হলেও আলাদা রকম ছিল। কেননা এই পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে নারীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কষ্টকর সেখানে অটোচালক অনিতা কুদতারকার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মুম্বাই-এর মতো এক বিশাল মেট্রোপলিটান শহরে অনিতাদেবী হলেন একমাত্র মহিলা আটোরিক্সা চালক।

গত আট বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে তিনি যুক্ত। মুম্বাই পৌরসভার অর্ন্তগত ৫০ জন মহিলাকে অটোরিক্সা চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে এখন একমাত্র তিনিই অটো-চালক। অনিতাদেবী মানিকপুর, ভাসাই (পশ্চিম) এর বাসিন্দা। মূলত গাড়ী চালাতে ভালোলাগা এবং নিজেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্য তিনি এই পেশায় আসেন। এস. এস. সি. শিক্ষিতা অনিতা দেবীকে গাড়ী চালানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ২০০২ সালে আবেদন করা হয় এবং তাতে সাড়া দিয়েই আজ তিনি এই পেশায়।

অনিতাদেবী ভাসাই-এর এক পরিচিত

অনিতা কুদতারকার

মুখ। কিন্তু সমস্যা হলো এখানে পুরুষ যাত্রীরা তার অটোতে উঠতে চায় না। কারণ অটোর লাইনে দাঁড়ালে তাকে সবার পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে যাত্রী তিনি তেমন পান না। এক্ষেত্রে অনিতাদেবীই বিপাকে পড়েন। তার সংসারের খানিকটা হলেও এই অটোর রোজগারে চলে। তাই সবসময় চেষ্টা করেন তার পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে । অবশ্য তারাও এখন বুঝতে পেরেছেন এটাই তার রুজি-রোজগারের প্রধান উৎস। কাজের সময় তিনি সাধারণত পড়েন সাদা সালওয়ার স্যুট। পুরুষযাত্রীদের সঙ্গে আসন ভাগ করে নিতে তার কোনও অসুবিধা হয় কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, গড়পড়তা মহিলাদের তুলনায় তিনি পুরোপুরি আলাদা।

অনিতাদেবীর মতে তিনি হলেন সেই ধরনের মহিলা যে চুলও বাঁধতে পারেন আবার রান্নাও করতে পারেন। ভারতের এই 'আধুনিক' পুরুষশাসিত সমাজে অনিতাদেবীর মতোন মহিলারা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কর্মযোগিনী বন্দনীয়া তাঈজী

শিবাণী চট্টোপাধ্যায়

একটি সদাপ্রবাহমান কর্মধারা, যাঁরা নাম সরস্বতী তাঈ আপ্টে। জন্মসূত্রে তাপি নদীর নামের ছোট্ট মেয়েটির উচ্ছ্বল তরঙ্গ পরিণত বয়সে সরস্বতী নাম নিয়ে তার স্নেহ বিন্দু পৌঁছে দিতে পেরেছিল দেশের প্রতিটি কোণায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজের মাধ্যমে। মহারাষ্ট্রের কোঙ্কনের অঞ্জর্লে গ্রামে গঙ্গাধরপন্ত-এর ঘরে সাবিত্রীর কোল আলো করে যে মেয়েটি ১৯১০ সালের ১৭ মার্চ জন্মালো, বাবা-মা তার নাম রাখলেন তাপি। গঙ্গাধর রাও-এর মামা ছিলেন লোকমান্য তিলক। ফলে জন্মসূত্রেই দেশভক্তি, সমাজসেবা, আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকার ছিল তার রক্তে। তাপির বয়স যখন সাত, লোকমান্য তিলকের ডাকে গঙ্গাধররাও সপরিবারে পুণেয় চলে আসেন। পুণেতেই তাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। স্কুলে পড়ালেখা, দাদুর স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে ছোট তাপি বড় হতে থাকে। গঙ্গাধর পন্তজীর বড় মেয়ে মায়ী রুগ্ন হওয়ায় তাপিই সব বিষয়ে মা-বাবাকে সাহায্য করত। ছোট্ট বয়সেই তাই সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। এমনকী বাবার সঙ্গে বাজারে যাওয়া, ঠিকমতো চিনে জিনিস কেনা, টাকা-পয়সার হিসাব করা— এসব কাজেও দক্ষ হয়ে ওঠে। ছোট-ভাইবোনদের কখন কী দরকার, মাকে ঘরের কাজে কতটা সাহায্য করা যায়, শৈশব থেকেই সেটুকু বুঝে নিতে কখনও ভুল হতো না তার। জন্মগত এই সেবার মনোভাব তাঁর মধ্যে যে সংবেদনশীলতার জন্ম দিয়েছিল, তার দ্বারাই ভবিষ্যতে নিরলসভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন তিনি।

১৯২৫ সাল। তাপির বয়স তখন ১৫। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই পুণের স্কুলশিক্ষক বিনায়ক গোপালরাও আপ্টের সঙ্গে তাপির বিবাহ স্থির হয়। বাইশ বছর বয়সী বিনায়করাও-এর এটি ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম স্ত্রী কন্যার জন্মদান করেই মারা যায়। ছ'মাস বাদে মাতৃহারা শিশুকন্যাটিরও দেহান্তর ঘটে। পুত্রবধূ ও নাতনীর মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে বিনায়কজীর মা-ও বেশিদিন বাঁচলেন না। এই অবস্থায় বিনায়করাও আপ্টের জীবন অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। এমন সময় পুণে জেলা জুড়ে আকাল হওয়ায় নিজ গ্রাম চাসকমান ছেড়ে পুণে শহরে চলে আসেন বিনায়করাও। এখানে তার মামা-মাসি ও অন্যান্য আত্মীয়রা থাকতেন। এখানেই তিনি শিক্ষকের চাকরী পান। মাত্র তেরো বছর বয়সে পিতৃহারা বিনায়করাও খুবই দায়িত্বশীল ছিলেন। সামান্য জমির আয়ের উপর ছাত্র পড়িয়ে মা ও বোনকে দেখা, বোনের বিয়ে দেওয়া, সবই করেছেন। তখনকার দিনে বিপত্নীক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। পুণেতেই এমন সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে গঙ্গাধরপন্তজী মেয়ের বিবাহের দিন স্থির করলেন। বিবাহের পর তাপি হলো সরস্বতী আপ্টে। নিজের শশুর, শাশুড়ি না থাকলে, বিনায়কজীর মামা, মামী, মাসী, পিসি, কাকী ও অন্যান্য আত্মীয়রা পাশাপাশি থাকতেন। সরস্বতী সহজেই, তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে তাঁদেরই একজন হয়ে গেলেন। অন্যদিকে তাপির অভাব সাবিত্রীবাঈ ও গঙ্গাধরপন্ত প্রতি পলে অনুভব করতেন। শ্বশুরবাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় সরস্বতী প্রায়ই মায়ের কাছে এসে যেটুকু পারতেন সাহায্য করতেন। ধীরে ধীরে বসন্ত, কুমুদ ও বিজয়ার কলকাকলীতে সংসার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অন্যদিকে বিনায়করাও-এর শিক্ষার প্রতি অসীম আগ্রহ। সেইজন্য স্কুলের চাকরী, প্রাইভেট টিউশন-এর ফাঁকে ওকালতি পড়া শেষ করে ফেললেন। কিন্তু কোর্টের সদন না পেলে ওকালতি করা যায় না। এবং বেশ কিছু অর্থ জমা না করলে সদন পাওয়া যায় না। সরস্বতী স্বামীর এই সমস্যার সমাধান করলেন, নিজের কিছু গহনা দিয়ে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।

১৯৩৬ সালে আপ্টেজীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পরিচয় হয়। বাড়িতে এমনিতেই আপ্টেজীর নানা পরিচিত জনের সমাগম ঘটত। সংঘের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই পরিচয় অচিরেই রান্নাঘর পর্যন্ত প্রসারিত হল। বিভিন্ন সময় সংঘবন্ধুদের আনাগোনা, তাদের আতিথ্য করতে করতে সরস্বতীর অবসর বলে কিছু রইল না। এদিকে পূজনীয় ডাক্তারজী আপ্টেজীকে পুণের সংঘকার্যালয়ের দায়িত্ব দিলেন। বৈঠক, সম্পর্ক কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে পরায় আপ্টেজীর সংসারের জন্য সময় কমে যেতে লাগল। তিনি তখন সকলের 'দাদা'।

দেশ তখন পরাধীন। ঘরে সর্বদা জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা শুনে শুনে সরস্বতীর সংঘের কাজকর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। একদিন সাহস করে স্বামীর কাছে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেন— "এমন কাজ আমাদের মহিলাদের জন্য কি প্রয়োজন নেই?"

বন্দনীয়া সরস্বতী তাঈ আপ্টের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত

স্ত্রীর প্রশ্নে সম্মতি জানিয়ে আপ্টেজী বললেন, "প্রয়োজন অবশ্যই আছে এবং ভাবনাটাও খুবই ভাল।" স্বামীর সমর্থন পেয়ে আরও এককদম এগিয়ে সরস্বতী জানালেন "তাহলে আমাদের বাড়িতেই আগে শুরু হোক।" আপ্টেজী সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'নিজের সংসারের দায়িত্ব সামলে করতে পারলে কর। আপ্টেজীর সম্মতি পেয়ে উৎফুল্ল সরস্বতী একটি শনিবার ছোট দুই বোন ইন্দু, সিন্ধু, ভাইজী গঙ্গু ও প্রতিবেশী সিন্ধু কেতকর, মুধুমতি তাম্বে, কলাবতী দেবকুলে, সীতাতাঈ করন্দিকর, মন্দা লোংটে, ছত্রে তাঈ, কমল লিময়ে, বকুল নাতু ও আরো কয়েকজনকে বাড়িতে ডাকলেন। প্রায় পঁচিশজনকে প্রথমদিন সঙ্গে পেলেন। তাদের উদ্দেশ্যে অতি সহজ সরল ভাষায় জানালেন— আমরা স্ত্রীলোকরা আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি, স্বামী, সন্তান ও পরিবারের সকলের সেবা করি। এটা আমাদের কর্তব্য মনে করে করি। কিন্তু দেশের প্রতিও আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। আজ দেশ পরাধীন, দেশমাতা বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত। তার কোনও খবর আমরা রাখি কি? পুরুষরা নানা ভাবে সমাজ জাগরণের কাজ করছে। কিন্তু আমরা কি করছি? দেশ ও সমাজের এই দুর্দিনে আমাদের কি কিছু করার নেই? সরস্বতীর এই আহ্বানে সকলেই সম্মতি জানাল। ঠিক হলো, সপ্তাহে একদিন সকলে এই বাড়িতেই একত্রিত হবে। এরপর থেকে প্রতি শনিবার সরস্বতীর বাড়িতে মহিলারা আসতে লাগল। নানা বিষয়ে আলোচনা, মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র পাঠ এসব চলতে লাগল। বকুল ছিল ছোট, ওর আলোচনা তেমন মনঃপুত হতো না। খেলাধূলোয় বেশী আগ্রহ থাকায় পাশের মাঠে অন্যান্য ছোট মেয়েদের নিয়ে যোগচাপ, লাঠিখেলা এসব চলত। ইতিমধ্যে সরস্বতী সকলের 'তাঈজী' অর্থাৎ বড়দিদি হয়ে গেলেন। এই সময় একদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় ডাক্তারজী পুণেয় এলেন। যথারীতি আপ্টেজীর বাড়িতে এলেন। এই সুযোগে তাঈজী নিজের কাজ সম্বন্ধে তাঁকে জানালেন এবং তাঁর মার্গদর্শন চাইলেন। পূজনীয় ডাক্তারজী উত্তরে বললেন, "তাঈ, আপনাকে মার্গদর্শন করবেন ওয়ার্ধার লক্ষ্মীবাঈ কেলকর। ১৯৩৬-এর বিজয়া দশমীর দিন ওয়ার্ধায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শুভারম্ভ হয়েছে। ওয়ার্ধায় গেলে আমি ওনাকে আপনার কথা জানাব।"

১৯৩৮ সালে হঠাৎই একটা সুযোগ মিলে গেল। মৌসীজীর বাড়িতে থাকতেন কালিন্দীতাঈ পাটণকর। কালিন্দীতাঈ-এর বোন জিজী কেলকরের পুণের বাড়িতে মৌসিজীর যাওয়ার কথা। একদিন ছোট ছেলে আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় মৌসিজী এলেন তাঈজীর বাড়িতে। তাঈজী তখন দরজা বন্ধ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে প্রশ্ন শুনতে পেলেন, "এখানে কি সরস্বতীতাঈ আপ্টে থাকেন?" প্রশ্ন শুনে নীচে তাকিয়ে দেখলেন, একজন মধ্যবয়স্কা অতি সুন্দরী মহিলা, একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঈজী সাগ্রহে তাঁকে উপরে ঘরে নিয়ে বসালেন। মৌসিজী ডাক্তারজীর চিঠি দেখালেন। দুজনের কথা শুরু হল—যেন কতদিনের চেনা! লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন হলো। মৌসিজী সমিতির কাজের পরিচয় দিলেন। তাঈজী এতদিন কিভাবে কাজ করেছেন জানালেন, এবং এ-ও জানালেন ভবিষ্যতে তাঁর সমস্ত কর্মপ্রবাহ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মূল ধারায় প্রবাহিত হবে। সমিতি-রূপে ছোট গাছটিতে আর একটি শাখা সংযোজিত হল, যার নাম পুণে। এরপর সাংলী, সাতারা, ফরাড, ভাণ্ডারা, আকোলা— ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রের কোণায় কোণায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি নামটি পরিচিত হতে লাগল।

অন্যদিকে সংঘের কাজও পুণেয় বহুল পরিমাণে বাড়তে থাকে। ফলে আপ্টেজীর বাড়িতেও সংঘবন্ধুদের যাতায়াত তাদের আপ্যায়ণ এমনকী যে দূরে যাবে, তাকে পথের খাবার, টাকা-পয়সা সবেরই ব্যবস্থা করতে হোত। চল্লিশের দশক, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জোয়ারে দেশ উত্তাল, তাঈজীর সংসারে এরই পরোক্ষ ঢেউ আছড়ে পড়ল। সংঘের কাজের জন্য আপ্টেজী ওকালতি ছেড়ে পূর্ণকালীন সংঘকাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে তাঈজীকে জানালেন। শান্ত মনে স্বামীকে সম্মতি জানালেও ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেন। সংসার খরচ ছাড়াও দিনভর অতিথির আনাগোনা কিভাবে সব চলবে, এই চিন্তায় মনে পাহাড়ে জমে উঠল, কিন্তু প্রতিদিনের কাজ আগের মতোই চলতে লাগল—দেখতে দেখতে দেশ স্বাধীন হলো। ত্রিখণ্ডিত স্বাধীনতা— সেইসঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশছাড়া, ঘরছাড়া হলো। চারদিকে লুটপাট, বলাৎকার, হিংসায় সাধারণ মানুষ ত্রস্ত। সমিতির কাজ ততদিনে অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় বহু সেবিকাও পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছে। তাদের কিভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায় সেজন্য চিন্তাভাবনা চলছে। মৌসিজী বালকমন্দির, ছাত্রাবাস, উদ্যোগ মন্দিরের প্রস্তাব রাখলেন। মুম্বইতে এধরনের বড় সামাজিক কাজের দায়িত্ব নিতে পারায় সাধারণ সেবিকারা তো বটেই তাঈজীর মনেও এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ল।

বিনা-মেঘে বজ্রপাতের মতো ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজী আততায়ীর হাতে নিহত হন। গান্ধীজী হত্যাকাণ্ডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ জড়িত, এই অপপ্রচারের ফলে সংঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা সাধারণ মানুষের আক্রমণের মুখে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই আপ্টেজীর বাড়িতে কিছুমানুষ অগ্নিসংযোগ করে। সেসময়ে তিনি সংঘের কাজে বাইরে ছিলেন। স্বয়ংসেবকরা সময়মত আগুন নিভিয়ে তাঁদের ঘর রক্ষা করেন। তাঈজী ভয় না পেয়ে স্থির করেন, তার কারণে বাড়িতে হামলা হলে বাড়ির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। সেখানেও বিপদ পিছু নিল। অবশেষে তাঈজীর এক বন্ধু কমলতাঈ মাণ্ডকের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় মৌসিজী সমিতির বাহ্যিক কাজকর্ম স্থগিত রাখলেন। কিন্তু সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকঠাক চলতে লাগল। সংঘের যেসব কার্যকর্তারা-আত্মগোপন করেছিলেন বা সত্যাগ্রহে গিয়েছিলেন, তাদের পরিবারে নিয়মিত যোগাযোগ করা, সাহস দেওয়া, ভরসা যোগানোর কাজ করে গেছেন। তখন আপ্টেজীও কারারুদ্ধ, জেলে নিয়মিত তাঁর সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের খবরাখবরও সংগ্রহ করে তাদের পরিবারে জানিয়ে আসতেন। অবশেষে ১৯৪৯ এর ১২ জুলাই সরকার গান্ধীজী হত্যার কোনও প্রমাণ না পেয়ে সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কিন্তু ১৮ মাসের সরকারী দমনে বহু মানুষ ভয়ে, চাকরী খোয়ানোর কষ্টে, বা সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতায় সংঘ বা সমিতির কারারুদ্ধ হওয়ার প্রতি বিরূপ হয়। এই পরিস্থিতি থেকে সংগঠনকে পুনরুদ্ধার করার জন্য তাঈজী কঠোর পরিশ্রম শুরু করলেন। ১৯৫৩-র "ভারতীয় স্ত্রী জীবন বিকাশ পরিষদ" গঠন করলেন। সমিতির শারীরিক, বৌদ্ধিক বিষয়গুলি পুর্নবিবেচনা করে আধুনিক করা হলো। তাঈজীর উপর সাংগঠনিক দায়িত্বও বাড়ল।

সেবা ভাবনা ছিল তাঁর প্রতি রক্তকণায়। ১৯৬১ সালে পাঞ্চেত বাঁধ ভেঙে যায়। বাঁধাভাঙ্গা জলে পুণের মানুষ বিপর্যস্ত। তাঈজী ঘরে ঘরে গিয়ে ত্রাণসামগ্রী জোগাড়ে ব্যস্ত হলেন। অন্যান্য মহিলা সংগঠনও এগিয়ে এলো। তাদের নিয়ে একত্রে তাঈজী সংযুক্ত স্ত্রী সংস্থা গঠন করে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণে কাজে লাগলেন। তাদের সঙ্গে চিরদিন সম্পর্ক রেখেছেন। এরপরই ঝাঁপ দেন গোয়া মুক্তি আন্দোলনে। পর্তুগীজদের হাত থেকে গোয়া পুনরুদ্ধারের জন্য গোয়ামুক্তি সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয়। আপ্টেজী, তাঈজী, এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। সেসময় কেসরীবাড়া যেন ছাউনীতে পরিণত। সেখানে থেকে সত্যাগ্রহীদের দল গোয়ায় পাঠানো, তাদের খাওয়া-দাওয়া, অর্থসংগ্রহ সবকিছুতে সেবিকাদের নিয়ে সহায়তা করেছেন।

১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি আপ্টেজীর ক্যানসার ধরা পড়ে। তাঈজীর চোখের সামনে আপ্টেজী একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বুকে পাথর চাপা দিয়ে অবিচল চিত্তে স্বামীকে দেখাশোনা করছেন। একসময় ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সকলকে ডেকে পাঠালেন। এগারোটি নাতি-নাতনীর কলকোলাহলে মুখর হয়ে রইল বিনায়করাও আপ্টের জীবনের অন্তিম দিনগুলি। অবশেষে ১৯৬৭ সালের ১১ জানুয়ারী সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। দীর্ঘ ৪২ বছরের সম্পর্কের অন্তিম বিচ্ছেদ হলো। এই দুঃসংবাদ মৌসিজীর কাছেও পৌঁছাল। মৌসিজী পরম মমতায় সান্ত্বনার হাত রাখলেন।

সেসময় পুণেয় মৌসিজীর প্রবচনের কার্যক্রম স্থির হলো। মৌসিজী তাঈজীকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তিনি যেন সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্য বিষয়গুলি চিহ্নিত করেন। আসলে মৌসিজীর স্বামী বিয়োগের দুঃসহ অভিজ্ঞতা ছিল। এসময় তাঈজীর মনের অবস্থা কেমন, তা তিনি বিলক্ষণ

(এরপর ১১ পাতায়)

জলসঙ্কট রুখতে বিদ্যুৎচালিত পাম্প নিষিদ্ধ গুজরাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষের ভূ-গর্ভস্থ (মাটির তলার) জল-সংকট নিয়ে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনটা রীতিমতো পিলে-চমকানো। আগামী ২২ মার্চ, 'বিশ্ব নীর (জল) দিবসে'র প্রাক্কালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের সমীক্ষায় বলেছে, ইতিমধ্যেই এদেশের ভূগর্ভস্থ জলস্তরের পরিস্থিতি জটিল (ক্রিটিক্যাল), অর্ধজটিল (সেমি ক্রিটিক্যাল) এবং কিছু ক্ষেত্রে জলস্তর আক্ষরিক অর্থেই 'বিলুপ্তপ্রায়' (ওভার-এক্সপ্লয়েট) অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সতর্কতা—যেভাবে সতর্কীকরণ সীমা (অ্যালার্মিং স্টেজ) ছাড়িয়ে জলস্তর নামতে শুরু করেছে তাতে ২০২৫ সালও যেতে হবে না, তার আগেই ভারতে মাটির তলার জলের অন্তত ৬০ শতাংশ 'ব্লকে'র পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে।

এই প্রতিবেদনটা এমন একটা সময় প্রকাশিত হলো যখন দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি এই সত্যটাও মেনে নেওয়া দরকার যে ভারতে মাটির তলার জল ব্যবহারকারীর সংখ্যাটা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। প্রতি বছর কমসে কম ২৩০ কিউবিক কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ জল এদেশের মানুষ ব্যবহার করছেন কোনও না কোনওভাবে। সারা বিশ্বের নিরীখে ধরলে চারভাগের একভাগ মাটির তলার জল-ই খরচ করে ফেলছেন ভারতবাসীরা। সুতরাং এদেশে জলস্তর নামবে না তো কোথায় নামবে?

এই মাটির নীচের জল সবচেয়ে কাজে আসে উত্তর-ভারতে। সেখানকার গ্রামীণ ও

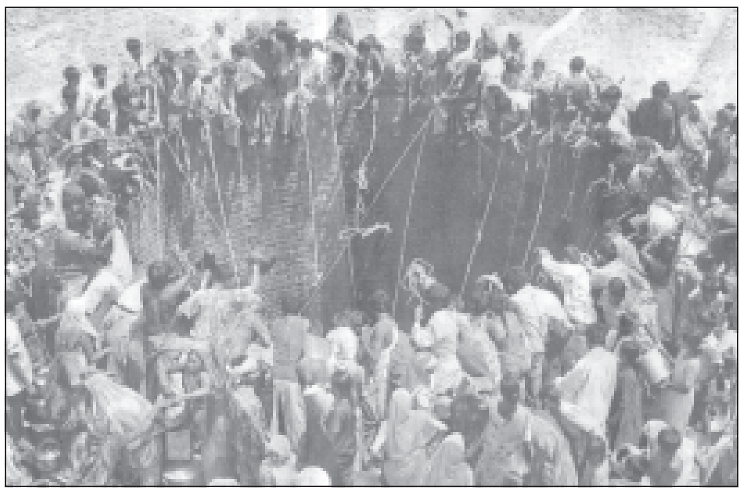

শহর-সংলগ্ন এলাকাগুলোতে মানুষ মূলত মাটির তলার জলের ওপরই নির্ভর করে থাকেন। এই জলেই সেখানে কৃষিকাজের প্রায় ষাট শতাংশই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া শহরগুলোতেও যে জল-সরবরাহ হয়ে থাকে তার আশি শতাংশই মাটির তলার জল। আসলে মাটির নীচে জল পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ খরচাপাতি করতে হয় না। সেই কারণে এর চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য উৎসগুলোকে কাজে লাগালে মাটির নীচের জলের ওপর এতটা টান পড়ে না। কিন্তু স্বাধীনতার সওয়া ছ'দশক পর ভারতবর্ষের অঙ্গ-রাজ্যগুলি সেই বিকল্প উৎসের সন্ধান করল না কেন তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এই অঙ্গ রাজ্যগুলোর মধ্যে অবশ্যই ব্যতিক্রম গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশ। তবে অন্ধ্রপ্রদেশ নির্ভর করেছে মূলত কৃষকদের 'আত্মত্যাগে'র ওপর। কৃষকরা যতটুকু প্রয়োজন সেই মতো মাটির তলার জল ব্যবহার করে একপ্রকার 'বাঁচিয়ে' দিয়েছে রাজ্য সরকারকে। কিন্তু গুজরাট সরকার প্রথম থেকেই যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা বেশ কার্যকরী হচ্ছে।

জলের বিকল্প উৎসের সন্ধান করার পাশাপাশি গুজরাটে সম্পূর্ণ সরকারি প্রযোজনায় জ্যোতিগ্রাম প্রকল্পের সফল রূপায়নও সাধিত হচ্ছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, জল সরবরাহকে সম্পূর্ণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হলো কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ, অপরটা অকৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহ। ইলেকট্রিক ফিডারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল তোলার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ জারি হয়েছে গুজরাটে। যার ফলে গ্রামীণ যাযাবরবৃত্তির ওপর বড় ধরনের লাগাম পরানো সম্ভব হয়েছে। জলের অভাবে আজ এখানে, তো কাল ওখানে—এই পালা এখন সাঙ্গ হবার পথে।

ভারতবর্ষের সাতটা রাজ্য—অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে ভূগর্ভস্থ জলের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। পরিস্থিতির উন্নতিতে প্রায় সবকটা রাজ্যই কম-বেশি চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতে সবচেয়ে বড় সমস্যা পলিমাটির অকস্মাৎ ক্ষয়ে যাওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়া। কিন্তু উল্লিখিত প্রকল্প-মাফিক গুজরাট এই সমস্যাকে প্রায় কাটিয়ে উঠেছে বলা যায়। সাংবাদিক খিমি থাপা মন্তব্য করেছেন, ভূগর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনায় গুজরাট মডেলকে ভারতের সবকটি রাজ্যের অনুসরণ করা উচিৎ।

গুজরাটের এই সাফল্যের সব চাইতে বড় কারণ বিদ্যুতায়ন। এর ফলে ময়েশ্চারের (মাটির ওপর একটা আচ্ছাদন) বিপত্তি কাটিয়ে কৃষিতে ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহের ক্ষেত্রে একটা 'ম্যানেজমেন্ট' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য-প্রশাসন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল গুজরাট প্রশাসনের মাথায় নরেন্দ্র মোদী আসার পরেই। সে কারণে ২০০২ সাল নাগাদ গুজরাতবাসী যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করতেন, ২০০৬ সালে তার থেকে ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৩৭ শতাংশই কমিয়ে ফেলেন তাঁরা। এর একটা বড় কারণ, রাজ্যবাসীর সচেতনতা তো আছেই, সেইসঙ্গে বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ-এর মাধ্যমে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করেছিল গুজরাত সরকার।

বিগত চারবছরে সেই প্রচেষ্টা আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে রাজ্য-সরকার। আর এ কাজে তাদের সবচেয়ে বড় সহায়ক রাজ্যবাসী।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে একাই যুঝছে বিহার সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সর্বগ্রাসী বিশ্বায়ন আর সর্বব্যাপী বিশ্ব উষ্ণায়নের করুণতম চিত্রটা দেখতে হলে আপনাকে আসতে হতে পারে পূর্ব ভারতের বিহার রাজ্যে। এই রাজ্যেরই ভোজপুর জেলাকে একসময় ধানের গোলা (বাউল অব প্যাডি) বলে

অভিহিত করা হোত। বর্তমানে সেখানে আগের তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কম উৎপাদন হচ্ছে। ভোজপুরসহ আরও ছাবিবশটি জেলাকেই খরাপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বিহারে। উত্তর বিহার বিখ্যাত ছিল তার ভুট্টা উৎপাদনের নিরীখে। কিন্তু সেখানকার জমিও একপ্রকার পতিত হয়ে পড়ে রয়েছে। আসলে মরসুমের অধিকাংশ সময়েই খরার কারণে পুরো চাষের জমিটাই ফুটি-ফাটা অবস্থায় থাকে। সুতরাং ভুট্টা সেখানকার অধিকাংশ জায়গাতেই এখন দূরঅস্ত। শেষ দু'বছর ধরে লাগাতার খরার কবলে পড়েছেন বিহারবাসী। সবমিলিয়ে দু'কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সরকারি তথ্যানুযায়ী প্রায় ১ কোটি ২৬ লক্ষ মানুষ খাদ্য সংরক্ষণজনিত সমস্যায় ভুগছেন। সেখানকার কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষেরা বলছেন, এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। নীতিশ সরকারের আমলে সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হলেও তা আবহাওয়ার সাম্প্রতিক খাম-খেয়ালিপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। গরম এত দীর্ঘায়িত হচ্ছে যে, ফসলের দফারফা হয়ে যাচ্ছে। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেইসমস্ত মানুষ যাঁরা শস্য-পণ্য বেচে সামান্য মুনাফা করার আশায় সারাটি বছর ছোট্ট একটুকরো ঘরে হাপিত্যেশ করে বসে থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক 'অর্থনৈতিক তথ্য' সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের লাগোয়া বিহারের টিলা-সমৃদ্ধ অঞ্চলটিতে ইদানীংকালে নিদারুণ জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। সেখানে গোটা সতের জেলা জুড়ে ভূ-গর্ভস্থ জল গত জুন মাসে প্রায় ৩০ থেকে ৭০ ফুট নেমে গিয়েছে স্রেফ সময়ে বর্ষা না আসার কারণে। ওই অঞ্চলটিতে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার কারণে বিহারের কৃষি-অর্থনীতিও ইতিমধ্যেই বেশ ডামাডোলের মুখে পড়েছে।

এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, করণীয় কি? রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় তার সবকিছুই প্রায় করা হয়েছে। প্রথমত, 'ফুড স্টোরেজ' গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে। কারণ, 'ক্লাইমেট প্যাটার্ন'টা আগামীদিনে কী আকার ধারণ করবে তা নিয়ে বেশ ধন্ধে রয়েছেন বিহারের প্রশাসক, এমনকী গবেষকরাও।

তবে জলাভাবে কৃষি-অর্থনীতি যতটা না বিপর্যস্ত হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি গাড্ডায় পড়েছে গবাদি পশু সংক্রান্ত অর্থনীতি। কারণ, বিহার সরকারের প্রচেষ্টায় যদিও বা কৃষিকাজের জন্য সুন্দর সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা কিন্তু গবাদি পশুর কোনও উপকারে লাগার কথা নয়। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ষাঁড় ও মুরগী গত কয়েক বছরে স্রেফ জলাভাবে বিপুল সংখ্যায় মারা গেছে। কৃষকেরা চেষ্টাচরিত্র করে গবাদি পশুদের এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে নিয়ে গেলেও জলাভাব সর্বত্রই। আর এই ধাক্কাতেই তেণ্ডুলকার কমিটি দেখিয়েছে, প্রায় ৫৪ শতাংশ মানুষ এখানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। রাজ্য সরকার তাদের নিজস্ব পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বলেছেন, ৭৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। এদের উন্নতিকল্পে বিহার সরকারের দাওয়াই যত বেশি সম্ভব 'ফুড স্টোরেজ' গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে জলবায়ুর মন বুঝে ৬০ শতাংশ পতিত কৃষিজমিকে পুনরুদ্ধার করা।

সত্যি কথা বলতে কী, বিহার সরকার তার কর্তব্য প্রায় ঠিকঠাকভাবেই পালন করছে। কিন্তু কি ভূমিকা নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার? এর পেছনে 'সূক্ষ্ম রাজনীতি'র ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। বিহারের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'র (ডিসেরেবল গ্রোথ) জন্য যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া স্বয়ং অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বিহার সরকারকে। অথচ এই 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' মোকাবিলায় সেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাত এখন রিক্ত।

ভ্রমণকথা

কুমায়ুনে কয়েকদিন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

এক ঘেয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেতে, ছেলের স্কুলের গরমের ছুটির মাঝে (১৮.০৪.০৮) দৈনন্দিন জীবনের বেড়ি কেটে এবার রওনা দিলাম হিমালয় রাণী কুমায়ুনের উদ্দেশ্যে। লক্ষৌ হয়ে কাঠগুদাম পৌঁছলাম নৈনী এক্সপ্রেসে করে ভোরবেলা। আমরা তিনজন—আমি, আমার স্ত্রী ও পুত্র। ললিত পান্ডেজী আমাদের চালক। রওনা হলাম কুমায়ুনের রাজধানী আলমোড়ার উদ্দেশ্যে। পথে একটা সরাইখানায় স্নান করে কিছু জলখাবার খেয়ে আঁকা-বাঁকা পথে যাত্রা শুরু হলো। পথের ধার দিয়ে বয়ে গেছে গোলা নদী। কুমায়ুনের পাহাড়ের কোলে কোলে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক সরোবর। যা এখানে 'তাল' নামে খ্যাত। পথ চলতে এখানে 'ভীম তাল' ও 'সাত তাল' দর্শন হলো। ভীমতালের থেকে সাততাল অনেকটা বড়। সাতটি তালের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বলে সাততাল। চারধারের পাহাড়ে ওখ গাছের ঘন জঙ্গল আর তার কোলে সরোবর। জলের রং পার্থক্য প্রমাণ দেয় তাল সমন্বয়ের। যেতে যেতে পথের মাঝে পড়ে ভাওয়ালী। এখানকার ফলের বাজার। এখান থেকেই কুমায়ুনের ফল বিদেশ যাত্রা করে। ললিত ভাইয়া দেখায় পথের ধারে আখরোট, আলুবখরা, আপেল, নেসপাতি, কমলা লেবু, পুলম প্রভৃতি ফলের বাগান।

জগেশ্বর শিব মন্দির।

পথ চলেছে কোশী নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। পথের ধারে নীম করোরী মহারাজ-জীর আশ্রম ছাড়িয়ে আমরা এসে পড়লাম এক নির্জন স্থানে। নাম কারবালা। রাস্তার ধারে ওখ গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট সৌধ। ললিত ভাইয়া জানাল এটা হলো 'স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বিশ্রামাগার'। ১৮৯০ সালে অখণ্ডানন্দজীকে সঙ্গে করে কাঠগুদাম থেকে পায়ে হেঁটে পথ শ্রমে ক্লান্ত স্বামীজী এখানে এসে পৌঁছান।

আলমোড়ায় স্বামীজী এসেছেন তিনবার। থেকেছেন লালা বদ্রী শা'র আতিথ্যে। শহরের মধ্যে রঘুনাথজীর মন্দিরের নিকটে সেই বাড়ি এখনও তেমনি আছে।

শহরের উত্তর প্রান্তে কাশ্যপ পাহাড়ের মাথায় কাশার দেবীর মন্দির। পুরাণে আছে এখানেই 'মা দুর্গা' কৌশানী রূপ ধারণ করেছিলেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করবার জন্য। এই পাহাড় থেকেও দেখা যায় হিমালয়ের পর্বত শৃঙ্গ নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাদেবী-২ পঞ্চু চুল্লী প্রভৃতি। কিন্তু এ সময় সবই ধোঁয়াশায় ভরা। আবছা আবছা দৃশ্যমান আজ। শহর থেকে ৮ কিমি দূরে চৈতাই-এ এই অঞ্চলের বিখ্যাত গল্লু দেবতার মন্দির। ইনি এক রাজপুত্র ছিলেন। কিন্তু অলৌকিক শক্তির জন্য দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, আর ভক্তরা মন্দিরে ঘন্টা দান করেন। তাই মন্দিরে ঢোকা থেকে সর্বত্র ছোট-বড় নানান মাপের ঘন্টা বাঁধা।

আলমোড়া থেকে পিথারোগড় যাবার পথে ৩৪ কিমি দূরে জগেশ্বর শিবের মন্দির। পাহাড়ী পথের দুপাশে সিলভার ওখ গাছের ঘন বন। বিশাল বিশাল ওখের ঘনবন আর পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জটাগঙ্গা নদী। একটি ছোট চত্তরে গড়ে উঠেছে অজস্র ছোটবড় মন্দির। রয়েছে সূর্য, কেদারনাথ, জগেশ্বর, নবদুর্গা, নীলকণ্ঠ, পুষ্টিদেবী হনুমানজী প্রভৃতি দেবতার মন্দির। আর সবচেয়ে বড়

সাহিত্যের পাতা

মন্দিরটা হলো মহামৃত্যুঞ্জয় শিবের মন্দির। তাঁকে বলে বুড়ো শিব, আর জগেশ্বর হলেন বালক শিব। ইনি দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গের অন্যতম। জানা যায় এই মন্দির প্রায় ২৫০০ বছরের পুরানো। ১৭৯০ খৃস্টাব্দে চাঁদরাজারা এই জগেশ্বর ধামের জন্য অনেক গ্রাম ও অর্থ দান করেছিলেন। গঠন শৈলী অদ্ভুত, পাথরের উপর পাথরের চাঁঙড় বসিয়ে অনেকটা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গেশ্বর মন্দিরের ধাঁচে তৈরি। শিবরাত্রি আর শ্রাবণ পূর্ণিমায় মেলা বসে, লাখ পুণ্যার্থীর ভীড় হয়।

সকালবেলা রওনা হলাম পাতালভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে। রায়আগর থেকে ১৭ কিমি দূরে। পথমধ্যে চা-জলখাবার। এখানে জলখাবার বলতে আলুর পরোটা সঙ্গে আচার আর টকদই। পাহাড়ের অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে পাতালভুবনেশ্বর। শিবঠাকুরের অন্যতম পীঠস্থান। কিছু দূর গিয়ে গুহায় ঢোকার প্রবেশ পথ। ঢোকার আগে নাম ঠিকানা নথিভুক্ত করতে হয়। কিছু টাকার বিনিময়ে মেলে গাইড কাম পূজারী। সংকীর্ণ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ নীচের দিকে ১০/১৫ ফিট নেমে গেছে। পাথর গাত্রে মিটমিটে আলো জ্বলছে জেনারেটরের সাহয্যে, গাইড পথ দেখিয়ে নীচে নামছেন। কোন রকমে বসে বসে দু'পাশের পাথর বা শিকল ধরে সাবধানে নীচের দিকে নামতে থাকা। খানিক পরে পৌঁছান গেল গহ্বরের অভ্যন্তরে। গাইড দেখালেন যেখান দিয়ে প্রবেশ করলাম তার উপরের দিকটা সাপের ফনার উপরের চোয়ালের মতো। গাইড বলে চলেন এটা হলো শেষনাগের ফনা। আমরা এখন শেষনাগের পেটের অভ্যন্তরে। সামনে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা। এখন আমাদের পথচলা শিরদাঁড়ার উপর দিয়ে তার লেজের দিকে। দেখা যায় চলার পথের পাথরে শিরদাঁড়ার মতো খাঁজ কাটা। অন্ধকার গুহার মধ্যে লম্বা সরু পথ ধরে এগোনো। মাথার উপর বা পাশে পর্বত গাত্র রূপ নিয়েছে বিভিন্ন আকৃতির। গাইড বলে চলেন এই হলো অর্ধগনেশ। গুহার অন্তিমে পৌঁছে পূজারী পূজা করেন পাতাল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গের। পঞ্চ - পাণ্ডবও নাকি একদিন পূজা করেছিলেন এই লিঙ্গের। পরবর্তীকালে শংকরাচার্যও এই লিঙ্গের পূজা করেন ও পিতলের পাত দিয়ে লিঙ্গটিকে মুড়ে দেন।

এখান থেকে রওনা দিলাম চৌকরীর উদ্দেশ্যে।

দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজিকে এখান থেকেই দেখার কথা। কিন্তু বিধি বিরূপ। শীতের পরই মার্চ-এপ্রিল থেকে পাহাড়ের জঙ্গলে ঝরে পড়া পাতা জ্বালানো শুরু হয়ে যায়। তা নাহলে বর্ষায় নতুন ঘাস বা গাছের জন্ম হবে না। আর তারই ফল স্বরূপ সারা পর্বত গাত্রে ধোঁয়ার প্রাচীর।

আমরা রওনা দিলাম কৌশানীর উদ্দেশ্যে। পথে ১১২৬ মিটার উঁচুতে গোমতী নদীর তীরে বৈজনাথ দেবতার মন্দির। সেকালের চাঁদরাজাদের শিল্প, স্থাপত্য ও প্রস্তর ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শন এই মন্দির। অবশেষে কৌশানীর অনাসক্তি আশ্রমে পৌঁছলাম বেলা ২টা নাগাদ। বিধি আমাদের বাম তাই হিমালয় রাণীর পর্বতচূড়া অদেখাই রয়ে গেল। এখানে দু-এক দিন কাটাতে খারাপ লাগে না। গান্ধীজী এই অনাসক্তি আশ্রমে ১৯২৯ সালে ১২ দিন ছিলেন ও এখানে বসেই তিনি গীতার অনাসক্তি যোগ অধ্যায় রচনা করেন।

গল্লুদেবতার মন্দির

পাতাল ভুবনেশ্বরের প্রবেশ পথ।

কৌশানী থেকে গেলাম নৈনিতালে। ১৯৩৮ মিটার উঁচুতে এই নৈনিলেক। লম্বায় দেড় কিলোমিটার আর চওড়ায় ৫০০ মিটার। চারপাশ দিয়ে রাস্তা, পূর্ব পারের রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে মানুষ গড়ে তুলেছে আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন ইঁট-কাঠ-বালির ইমারত। এই রাস্তার নাম ম্যাল রোড। রাস্তার কোল থেকেই পাহাড়ের গা বরাবর শুধু হোটেল আর বাড়ী। আর এখানেই আমাদের মতো ভ্রমণ পিপাসুদের থাকার জায়গা জোটে। তবে এখনও পাহাড়ের কিছু অংশ ওখ প্রভৃতি গাছ শহর সভ্যতাকে রুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে নৈনি লেকে নৌকো চলছে। নৈনি লেক গভীরতায় ১০০ ফিটের উপর। তলায় রয়েছে সোকপিট, সর্বসময় অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আর আছে মাছ যা ধরা নিষেধ। সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে পাহাড়। সকাল-বিকাল লেকের পাশে ঘুরতে ঘুরতে নানারকম দোকান দেখতে দেখতে, ইচ্ছা হলে নৈনিতালের তৈরি মোমবাতীর হরেক রকম জিনিসের মধ্যে দু'একটা সংগ্রহ করে কয়েকটা দিন ভালোই কেটে যায়। আবার রোপ-ওয়ে করে ২২৭০মি উঁচুতে স্নো-ভিউ পয়েন্ট-এ উঠে সমস্ত নৈনি শহরটাকে দেখতে বেশ লাগে।

ভাবতে থাকি সত্যিই কি বিচিত্র রূপ বৈশিষ্ট এই হিমালয়ের। এক এক জায়গায় এক এক রকম। কুমায়ুনের রূপ বৈচিত্রের সঙ্গে মিলবে না গাড়োয়াল হিমালয়ের রূপ, অথবা উত্তর-পূর্বের রূপ লাবণ্যের সঙ্গে। তবে কুমায়ুনের রূপলাবণ্য দর্শন করতে হলে বর্ষার পরে শীতের শুরুতে এলেই আমাদের মতো ভ্রমণ পিপাসুদের মন ভরবে। গরমের সময় কুমায়ুনের পথে পথে ঘোরাই হবে, দর্শন হবে না পর্বত রাজ হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত পর্বত শৃঙ্গ সমূহকে। তাই একটা অতৃপ্তি নিয়েই ফিরতে হয়। মনকে প্রবোধ দিই আবার আসব, তবে শীতের শুরুতে।

গল্প

শ্যামলা মেয়ে

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

আশেপাশের দশটা গ্রামের মধ্যে জগৎপুর বিখ্যাত তার মহামায়া মন্দিরের জন্য।

মন্দিরটা একটা কোঠাবাড়ি।

শোনা যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আমলে তৈরি এই মন্দিরটা। প্রতিদিন প্রচুর পুণ্যার্থী আসে এখানে। পুজো দেয়, প্রসাদ নেয়। মন্দিরের পুরোহিত আদিনাথ ভট্টাচার্য বৃদ্ধ মানুষ! বয়স প্রায় নব্বই। কিন্তু এখনও যথেষ্ট কর্মঠ। রোজ দু'বেলা নিজের হাতে মায়ের পুজো দেন।

সেদিন ভক্তের সংখ্যা বেশীই হয়েছে। গতরাতে ছিল কালীপূজার পুণ্য লগ্ন। সকালে সবাই এসেছে মায়ের প্রসাদ নিতে। আদিনাথবাবু সবার হাতে হাতে ফলপ্রসাদ বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এই সময়ে তাঁর নজরে পড়ে ওপাশের থামের পাশে একটি ছোট্ট মেয়ে। বয়স আর কত হবে, বড়জোর দশ-বারো বছর, গায়ের রঙ শ্যামলা, শীর্ণাঙ্গী। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মেয়েটি একগাল হেসে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

আদিনাথ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিরে খুকি তুই কোথায় থাকিস? আগে তো কখনও দেখিনি? মেয়েটি বলে, আমি কয়েকদিন হলো এগাঁয়ে এসেছি। তোমার পুজোর তো খুব ভক্তি, তাই প্রসাদ নিতে এলাম।

—নে মা, বলে আদিনাথ তার হাতে কয়েকটা ফলের টুকরো দিলেন। মেয়েটি ফলগুলো তার কোঁচড়ে ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল। আদিনাথ বাকি ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করতে লাগলেন।

দু'মাস পর—

গ্রামের বর্ধিষ্ণু রায়বাড়িতে আজ সত্যনারায়ণ পূজা। তাদের কোঠাবাড়িতে হ্যাজাকবাতিও বসানো হয়েছে পূজা উপলক্ষ্যে। গ্রামের সাধারণ মানুষেরা দূর থেকে হ্যাজাকবাতির আলো দেখছে। ওখানে তাদের মতো উলুখাগড়ার প্রবেশ নিষেধ।

পূজারী সেই আদিনাথবাবু।

রায়বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাই গোল হয়ে ঘিরে বসেছে তাঁকে। পুজো শেষ করে আদিনাথবাবু শান্তির জল দিচ্ছিলেন সবার মাথায়।

এই সময় তার চোখে পড়ল বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই শ্যামলা মেয়েটি। আদিনাথবাবু হাতের ইশারায় ডাকলেন তাকে। মেয়েটি ছুটে যেই পুজোর প্রাঙ্গণে চলে এসেছে, রায়বাড়ির কর্তা দেবেশবাবু হাঁই-হাঁই করে উঠলেন।

—করছেন কি, করছেন কি ঠাকুরমশায়, যাকে তাকে এখানে ঢুকিয়ে দিলেন!

আদিনাথবাবু বললেন, তাতে কি হয়েছে রায়মশায়, ভগবান তো সবার জন্য।

রায়বাবু আমতা আমতা করে বললেন, তা— হলেও—এভাবে!

রায়গিন্নী মুখ সিঁটকে বললেন, এ্যাঁ, শাড়িটা পড়েছে দ্যাখো, কতকাল যে কাচেনি কে জানে।

আদিনাথবাবু বললেন, প্রসাদে তো সবার সমান অধিকার গিন্নীমা। রায়বাবু যান, ওকে একটা মিষ্টি দিয়ে আসুন।

রায়বাবু সাপের ব্যাঙ গেলার মতো মুখভঙ্গী করে মেয়েটির কাছে গিয়ে হাত ওপর দিকে রেখে বললেন, নে ছুঁড়ি।

মেয়েটি একপলক তার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো, অহংকারীর দান আমি নিইনা।

এই বলে মেয়েটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রায়বাবু রেগে বললেন, শুনলেন তো ঠাকুরমশাই, শুনলেন তো ওইটুকু ছুঁড়ির কথা, ধরতে পারলে চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নিতাম। আমার মুখের ওপর এতো বড়ো কথা! ওর পরিবারকে আমি গাঁ-ছাড়া করে ছাড়বো।

সেইদিন রাতেই হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে চোখ বুজলেন দেবেশ রায়মশাই।

পরদিন সকালে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে সকলেই উৎসুকভাবে ওই কথাই বলাবলি করছিল।

আদিনাথবাবু কিন্তু ঠিক সময়মতো মায়ের পুজো দিতে এলেন। মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, সেই শ্যামলা মেয়েটি চাতালের এককোণায় বসে চোখের জলে মুছছে।

—কিরে কাঁদছিস কেন? তোর কি হয়েছে?

মেয়েটি বলে, আজ আমার এক সন্তান মারা গেছে ঠাকুরমশাই।

—তোর সন্তান? বলিস কিরে! আদিনাথবাবু মজা করে বলেন।

মেয়েটি ভাঙাস্বরে বলে, কুসন্তানও তো সন্তান ঠাকুরমশাই।

দ্যাখো পাগলির কথা, বলে ঠাকুরমশাই মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মেয়েটি সেই চাতালের কোণে বসে ফোঁপাতে থাকল।

কেরল প্রদেশে নববর্ষ উৎসব

শ্যামাপ্রসাদ দাস

প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরাতন চলে যায়, নূতন আসে। একই নিয়মে অরণ্যে আসে ঝরাপাতার দিন। কিশলয় ফুলের কুঁড়ি বুকে নিয়ে চুপি চুপি অরণ্যে রঙ ছড়ায়। আগে বসন্তসখা। ফুলে ফলে ভরে যায় অরণ্যবাসর। একেই বলে নব যৌবনা অরণ্যে নববর্ষ। প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যখন অরণ্যবাসী ছিলেন, তখন প্রাকৃতিক এই নবসাজ দেখেই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতেন। তারপর এলো গণিতিক হিসাব নিকাশ। উৎসবের দিনক্ষণ স্থান পেলো পঞ্জিকার পাতায়। উৎসবের সেই প্রথম দিনটিকেই বলা হয় নববর্ষ উৎসব। ভারতবর্ষ এক বিশাল বৈচিত্রময় দেশ। এ দেশের সব জায়গায় একই দিনে বসন্তকাল আসে না। তাই বিভিন্ন প্রদেশের নববর্ষের দিনক্ষণে কিছু ব্যবধান থেকেই যায়। সেই একই নিয়মে বাংলার নববর্ষের দিন আর কেরলের নববর্ষের দিনক্ষণ এক নয়। কেরলে প্রাচীন প্রথায় এখনও দিন এবং মাস গণনা করা হয় রাশিচক্রে। যেমন মাসের নাম মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীন। মালয়ালম ভাষায় বলে বৃশ্চিকম্, মকরম্, মীনম্ এমনি সব সংস্কৃত অলংকার যুক্ত নাম। মাসের মতন কেরল প্রদেশে দিনের নামও প্রাচীন প্রথায়। পুরাণ মতে চন্দ্রপত্নী সাতাশটি। কেরলে তাই সাতাশ দিনে এক মাস হয়। দিনগুলোর নাম—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুর্ণবসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধশিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী।

কেরলের ভাষার নাম মালয়ালম। যুগের পরিবর্তনে এবং বাংলা ও কেরলের নববর্ষের প্রথম মাসটির নাম সিংহ। মালয়ালম ভাষায় বলে চিঙ্গম মাসম। দিনটির নাম অশ্বিনী।

কেরলে বিশু উৎসব

মালয়ালম ভাষায় বলে অস্বতি; কিন্তু এখন নববর্ষের এই দিনটিতে কোন উৎসব অনুষ্ঠান হয় না। কেরলনিবাসীগণ সর্বভারতীয় তথা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বজায় রেখে বৈশাখী বা কিছু উৎসব পালন করেন। আর এই উৎসব এখন হয় অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ এবং অর্থবহ।

বৈশাখী বা বিশু উৎসবের সূচনা হয় চৈত্রের শেষ সপ্তাহের প্রথমদিনটিতে। তখন থেকেই বর্ষবিদায়ের সংকেত ঘোষিত হয় আতসবাজি পুড়িয়ে। নববর্ষের দিনটি যত কাছে আসে আতসবাজি পোড়ানোর ব্যাপকতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এসব নিয়ে ওখানে শব্দ দূষণ বা বায়ু দূষণের আইন কানুন জনিত কোনও বিধিনিষেধ বা বিতর্ক নেই। বরং অনেকেই যুক্তি দেখিয়ে বলে এতে বায়ুমণ্ডল দুষণ মুক্ত হয়।

চৈত্রের শেষ বিকেলে গৃহিণীগণ সমস্ত বাসনপত্র পরিস্কার করে সাজিয়ে রাখে। বাড়িঘর পরিস্কার করে আবর্জনা বিভিন্ন জায়গায় জড়ো করে রাখে। তারপর সন্ধ্যায় সেই আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এভাবেই পুরাতন বৎসরকে বিদায় জানিয়ে নূতন বৎসরকে আবাহন করা হয়। আর তাকে বরণ করার জন্য ঘরের প্রবেশ পথে জ্বেলে রাখা হয় ত্রিস্তর প্রদীপ। রাত্রে একটি ঘরের মেঝেতে দেওয়া হয় আল্পনা। সেই আল্পনার উপরে রাখা হয় একটি কাষ্ঠ পাত্র। মালয়ালম ভাষায় একে বলে মশা। এই পাত্রে রাখা হয় একগুচ্ছ নারকেল ফুল। তার চারপাশে সাজানো থাকে সনাল ফুল। কেরল নিবাসীগণ একে বলে কন্যাপুষ্পম। এই সুসজ্জিত পাত্রটিকে বলা হয় বিশুকেশী। নববর্ষের প্রতীক এই বিশুকেশী এবং ঘরের সাজসজ্জা শেষ হওয়ার পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে সবাই ঘুমাতে চলে যায়। তারপর রাত শেষ হয়। নববর্ষের নূতন সূর্য পুব আকাশে রঙ ছড়ায়। শুরু হয় মন্দিরে মন্দিরে সানাই মৃদঙ্গে মঙ্গলধ্বনি। নূতন বৎসরের সংকেত পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ বন্ধ করে সবাই বিছানা থেকে উঠে এসে প্রথম দর্শন করে বিশুকেশী। তারপর স্নান করে এসে সবাই সামিল হয় কুলদেবতার পূজার্চনায়। পূজা শেষ হলে গৃহস্বামী সকলের হাতে তুলে দেয় নূতন জামাকাপড়। এবার শুরু হয় সুন্দর পোশাকে সুন্দর করে সাজার ব্যস্ততা। হাসি আর খুশীর ছোঁয়ায় ভরে যায় সুন্দর কেরলের সুন্দর জনজীবন। তারা এবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে নিকটস্থ দেবমন্দির দর্শন করতে। সেখান থেকে ভক্তি ও ভাবাবেগে পরিপূর্ণ মন নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে আসে। ঘরে এসে আহার পানীয় গ্রহণ করে এবার শুরু হয় প্রতিবাসী এবং আত্মীয় পরিজনদের ঘরে ঘরে গিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা।

বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ বা বিস্পু-উৎসবে এভাবেই হয় উৎসব মুখর কেরলেরপরিচ্ছন্ন সমাজ জীবনের পরিচ্ছন্নতা অটুট রাখার সূচনা। যা চিরকালীন সৌন্দর্যকে অটুট রেখেছে সামাজিক এবং ধর্মীয় ভেদ-ভাবনাকে উপেক্ষা করে।

চিঠিপত্র

সাধারণ বাজেট ২০১০

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০-এ কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদের উভয় কক্ষে কেন্দ্রিয় বাজেট (২০১০-২০১১) পেশ করেন। এই বাজেটে তিনি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই ঊর্ধ্বমুখী, তার উপর বর্তমান বাজেটে পেট্রোল ও ডিজেলের দামবৃদ্ধি জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়াবে। এতে গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বর্তমান বাজেটে গরীব মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। লাগামছাড়া মূল্য বৃদ্ধির ইস্যুতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কেন্দ্রিয় বাজেটের দিনে সংসদের সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যবৃন্দ ওয়াকআউট করেন। বিজেপি সংসদে ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে ছাঁটাই প্রস্তাব আনবে।

কেন্দ্রিয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী আয়কর দাতাদের তিনটি স্তরে ভাগ করে কর ছাড়ের প্রস্তাব করেছেন এবং এর ফলে তাদের হাতে অধিক অর্থ আসবে এবং তারা যদি ওই অর্থ ব্যয় না করে দীর্ঘমেয়াদী Infrastructure Bond ক্রয় করেন, তবে আরও অতিরিক্ত কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীগুলিকেও আয়করের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বাজেটে সরকারের রাজস্ব আয় ভারতীয় মুদ্রায় ২৬,০০০ কোটি টাকা কমবে। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রী আমদানী শুল্ক ও Central Excise Duty বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর ৪৬,০০০ কোটি টাকার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রবীণ নাগরিকদের, অসংগঠিত শ্রমিকদের এবং আদিবাসীদের ও গরীব মানুষদের জন্য বাজেটে কোনও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৮৭ শতাংশ-এ। উপরন্তু বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি রোধের কোন কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। সব শেষ বর্তমান বাজেটে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের কোনও উল্লেখ নেই। তাই এই বাজেটকে জনস্বার্থ-বিরোধী, কৃষক, শ্রমিক বিরোধী বাজেট হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়।

—অধ্যাপক আশিষ রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩।

দেশভাগের ষড়যন্ত্র

আবার শোনা যাচ্ছে ভারতভাগের পদধবনি। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোট ভিখারি তথা ক্ষমতালোভী কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার গঠিত রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন সরকারি চাকরিতে ২০ শতাংশ পদ সংরক্ষণের সুপারিশ করেছে। তারা ১৫ শতাংশ পদ মুসলিম ও ৫ শতাংশ পদ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলেছে। কমিশন সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমাও দিয়েছে। তবে কমিশনের এই সুপারিশে হিন্দুরা হয়ে পড়েছেন আতঙ্কিত। সত্যি বলতে কী, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার সুবাদে সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণের উল্লেখ নেই। যা আছে তা হলো—তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষণ। কিন্তু এই সংরক্ষণ ৪৯ শতাংশের বেশি হতে পারবে না বলে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কমিশন সুপারিশকৃত সংরক্ষণ হবে কিসের ভিত্তিতে? যদি ধর্মের ভিত্তিতে হয় তবে তার জন্য করতে হবে সংবিধান সংশোধন। সেকাজে অবশ্য সরকারপক্ষকে হাপিত্যেশ করতে হবে না। সংখ্যালঘু তোষণকারী লালু, মুলায়ম, মায়াবতী, রামবিলাস, চন্দ্রবাবু ও বামমার্গীরা তো মুসলিমদের স্বার্থ চোখের মণির মতো রক্ষা করার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়েই আছেন। হিন্দুদের জন্য তাঁদের যেন কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। তাঁরা জাহান্নামে গেলেও তাঁদের কিছু এসে যায় না, আর যদি মুসলিমদের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত করা হয় তাহলেও প্রশ্ন উঠবেই—মুসলিমরা আর্থিক ও শিক্ষাগতভাবে কিছুটা অনগ্রসর হলেও, সামাজিকভাবে কী অনগ্রসর? ইসলামিক ধর্মশাস্ত্রে পরিস্কার বলা আছে—"মুসলিমরা জাতপাত, বর্ণ ও শ্রেণীভেদের ঊর্দ্ধে। আল্লার দৃষ্টিতে সব মুসলিম এক ও অভিন্ন।" তাহলে মুসলিমরা সামাজিকভাবে অনগ্রসর হন কিভাবে বা কোন্ যুক্তিতে? যাঁরা মুসলিমদের কিছু অংশকে সামাজিকভাবে অনগ্রসর বলে চিল-চিৎকার করছেন তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে মুসলিম উলেমা, ইমাম, মুফতি, মৌলভি বা ধর্মীয় নেতারাই বা কেন সত্য ঘটনাকে চেপে যাচ্ছেন? তাঁরা যদি ধর্মীয় নির্দেশকে মান্যই করবেন তাহলে তো তাঁদের উচিত কোনও মুসলিমকে সামাজিকভাবে অনগ্রসর রূপে চিহ্নিত করার প্রয়াসের বিরোধিতা করা। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনও বিরোধিতা আসছে না কেন? উল্টে তাঁরাই একশ্রেণীর মুসলিমকে সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আজ একজনও মুসলিম ধর্মগুরুকে বলতে শোনা যাচ্ছে না যে মুসলিমরা শিক্ষাগত ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর হলেও সামাজিকভাবে অনগ্রসর নন। কারণ মুসলিমরা ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিকভাবে এক ও অভিন্ন। সেক্ষেত্রে একজন আমির ও একজন মুসাফিরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অর্থাৎ মুসলিম সমাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সব মুসলিম একই সঙ্গে ধর্মীয় উপাসনা ও রীতিনীতি পালন করেন। ইসলাম স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, উঁচুজাত-নীচুজাত বা বর্ণবৈষম্যকে স্বীকার করে না। আর ভয় এখানেই। আজ যাঁরা সংরক্ষণের স্বার্থে ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে ভুলে থাকতে পারেন তাঁরাই যে কাল মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তুলবেন না তার গ্যারান্টি কোথায়?

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

মিশ্র বিয়েতে হিন্দু মুসলমানের মানসিকতা

দিলীপকুমার বিশ্বাস

জ ন ম ত

রিজওয়ানুর রহমান ও প্রিয়াঙ্কা টোডির বিয়েটা প্রিয়াঙ্কার বাপের বাড়িতে মেনে নেয়নি, কিন্তু রিজওয়ানুরের পরিবার শুধু বিয়েটাই মেনে নেয়নি, প্রিয়াঙ্কাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল বধূ হিসাবে।

আমার এক বন্ধু নূর রহমান (নাম পরিবর্তিত) বিয়ে করেছিল সায়নী ঘোষকে। নূরের পরিবার সায়নীকে সসম্মানে ঘরের বউ বলে ধুমধাম করে বরণ করলেন, কিন্তু সায়নীর বাবা মা ও আত্মীয়স্বজন এরপর কোনওদিনও সায়নীকে তাঁদের ঘরে ফিরতে দেননি।

কাঁকড়া অঞ্চলের জয় দেবনাথ (নাম পরিবর্তিত) একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করল। এক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েটির বাবা মা ও অন্যান্যরা জয়কে বলেন মুসলমান হওয়ার জন্য। মেয়েটিই তাঁর স্বামীকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দেয়। ফলে ওই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান ও বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল এক হয়ে ওই দুজনকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য করল। পুলিশ ছিল এক্ষেত্রে জেনে-শুনে নিষ্ক্রিয়। নিত্যানন্দ কানুনগো এক সময়ের কেন্দ্রিয় শক্তি মন্ত্রী, পরে উড়িষ্যার রাজ্যপাল। ওঁর ছেলে বিয়ে করেন এক মুসলমান মেয়েকে। নিত্যানন্দ কানুনগো পুত্র ও পুত্রবধূকে ঘরে তুলতে চাইলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী মানতে চাইলেন না। ওই দম্পতির পরবর্তীকালে দুটি সন্তানও হলো, কিন্তু কানুনগো গৃহিণীর একরোখা মনোভাব পুত্র ও পুত্রবধূকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দেয়।

আমার বন্ধু নূরের দুই খুড়তুত বোন স্বরূপনগর থানার বিথারি গ্রামের দুই যুবককে ভালবেসে বিয়ে করল। নূরের যে পরিবার হিন্দু পুত্রবধূকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবার ওই ঘরের দুটি মেয়ে যখন দুটি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করল তখন ওই একই পরিবার ওই মেয়ে দুটিকে চিরকালের মতো ত্যাগ করল আর ওই ছেলে দুটিকে। ওদের পরিবার থেকে ত্যাজ্যপুত্র করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। ওই দুটি মেয়ে হিন্দুবধূর মতো শাঁখা-সিঁদুর পরত। হিন্দুঘরের নিয়ম কানুন মেনে চলত, এরাই যখন পূজার উপকরণ সাজিয়ে দুর্গাপূজা মণ্ডপে পুজো দিতে গেল তখন গ্রহণ করা হলো না। ২০০৪ সাল আমার ছোটছেলেকে নিয়ে একটি স্কুলে গিয়েছিলাম, ওখানে সর্বভারতীয় একটি জয়েন্ট পরীক্ষা চলছিল। দুজন মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। কথায় কথায় বুঝলাম ওঁরা দুজনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এরপর অনেক কথার ভেতরে একটি কথা বেরিয়ে এল যে, ওঁদের দুজনের পরিবার সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কার মুক্ত আধুনিক মনস্ক। ওদের দুজনের স্ত্রীই হিন্দু ছিলেন। একজন বলেই ফেললেন আমরা হিন্দু মুসলমানের ভেদ নিয়ে মাথা ঘামাই না। কথায় কথায় আরও জানলাম ওদের একজনের দু'বোন। জিজ্ঞেস করলাম ওই দু'বোনের বিয়ে কি হিন্দু ঘরে হয়েছে না মুসলমান ঘরে? তখন উত্তর যা পেলাম তাতে বুঝলাম সংস্কার মুক্ত আধুনিক মনস্কতা কাকে বলে! ওঁরা বললেন মুসলমানের ঘরেই বিয়ে হয়েছে, ওঁরা আরও বললেন আমাদের পরিবারে অন্যধর্মে চলে যাওয়াটা মেনে নেয় না।

মুসলমান শাস্ত্রে অবশ্য একথা পরিস্কার বলা হয়েছে কোনও বিধর্মীকে বিয়ে করতে হলে তাকে মুসলমান করেই বিয়ে করতে হবে। তাই বোধহয় মুসলমান সম্রাট বাদশা ও অন্যান্য সম্পন্ন পরিবারে বিধর্মী মেয়েদেরই শুধু বিয়ে করে আনার প্রচলন ছিল, কিন্তু কোনও মুসলমান মেয়ে কোনও হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে বা করতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

স্ব স্ব ধর্মীয় মনোভাবই বোধহয় অধিকাংশ মানুষের মধ্যে চালিকা শক্তির কাজ করে। শুধু লেখক কবি কিংবা চিত্রকর হলেই অধিকাংশ মানুষের চরিত্র মূলগত ভাবে সম্পূর্ণ বদলায় না। মুসলমানদের জিহাদের ব্যাপক অর্থ আছে, এর অর্থ হলো অন্য ধর্মের লোকদের হত্যা করে সংখ্যালঘু করা অথবা বিয়ে বা অন্যান্য পথে মুসলমান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা।

অন্য ধর্মের লোকদের বুঝিয়ে, না বুঝলে বল প্রয়োগে ও জিজিয়া করের দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে মুসলমান হতে বাধ্য করে অন্য ধর্মের লোকদের সংখ্যাকে লঘু করা।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কেউ মুসলমান ধর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে কাউকে বিয়ে করলে তার প্রাপ্য ঘৃণা ও মৃত্যু। ধর্মীয় অনুশাসনই কি মুসলমান পরিবারে ছেলেদের অন্য ধর্মের মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে প্রেরণা জোগায়? তা নাহলে একই পরিবারে বা একই সমাজে হিন্দুমেয়েকে বধূ হিসাবে নিয়ে এলে সমাজের সমাদর কিন্তু নিজেদের ঘরের মেয়ের কোনও হিন্দু ছেলেকে বিয়েতে তাঁদের অনীহা কেন?

প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেনের নাতনি এক হিন্দু ছেলের প্রেমে পড়েন বলে শুনেছি। প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন ছেলেটিকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন এবং ছেলেটি প্রেমের মূল্য দিতে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন ও মুসলমান হন, তারপর ধুমধাম বিয়ে। হিন্দু মুসলমানের মিলনের এই রকম জিহাদি নীতি শুধু জাকির হুসেন নন আজকের বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তা করে দেখিয়েছেন।

অপর পক্ষে হিন্দু মানসিকতা যুক্তিহীনতার কূপে পচে মরছে। কোনও মুসলমান মেয়ে যদি কোনও হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে তখন হিন্দু বাবা মা সাধারণ ক্ষেত্রে মেনে নিতে চান না। যেমনটি ঘটেছিল স্বরূপনগর থানার বিথারি গ্রামের নূর রহমানের দুই খুড়তুত বোনের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে হিন্দুরা কৃষ্টির কথা বলেন আরও কত কি! কিন্তু কৃষ্টি কি একটা ঠুনকো কাঁচের বাটি নাকি? একটু টোকাতেই ভেঙে যাবে? চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের মেয়েকে বিয়ে করলে জাত যায়নি, ভীম হিড়িম্বাকে, অর্জুন উলুপীকে বিয়ে করাতে আর্য কৃষ্টির কি ক্ষতি হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। মুসলমানরা অমুসলমান মেয়েদের বিয়ে করে জিহাদ পুরো করে আর ক্ষহিষ্ণু হিন্দু সমাজ অন্য ধর্মের কেউ আমাদের ধর্মে যদি আসতে চায় তাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা উল্টে আমরা আমাদের সমাজ থেকে আমাদের লোকদেরই তাড়িয়ে দিয়ে হিন্দু আদর্শের নিদর্শন রাখার চেষ্টা করি। ধন্য ধন্য আমার হিন্দু সমাজ!

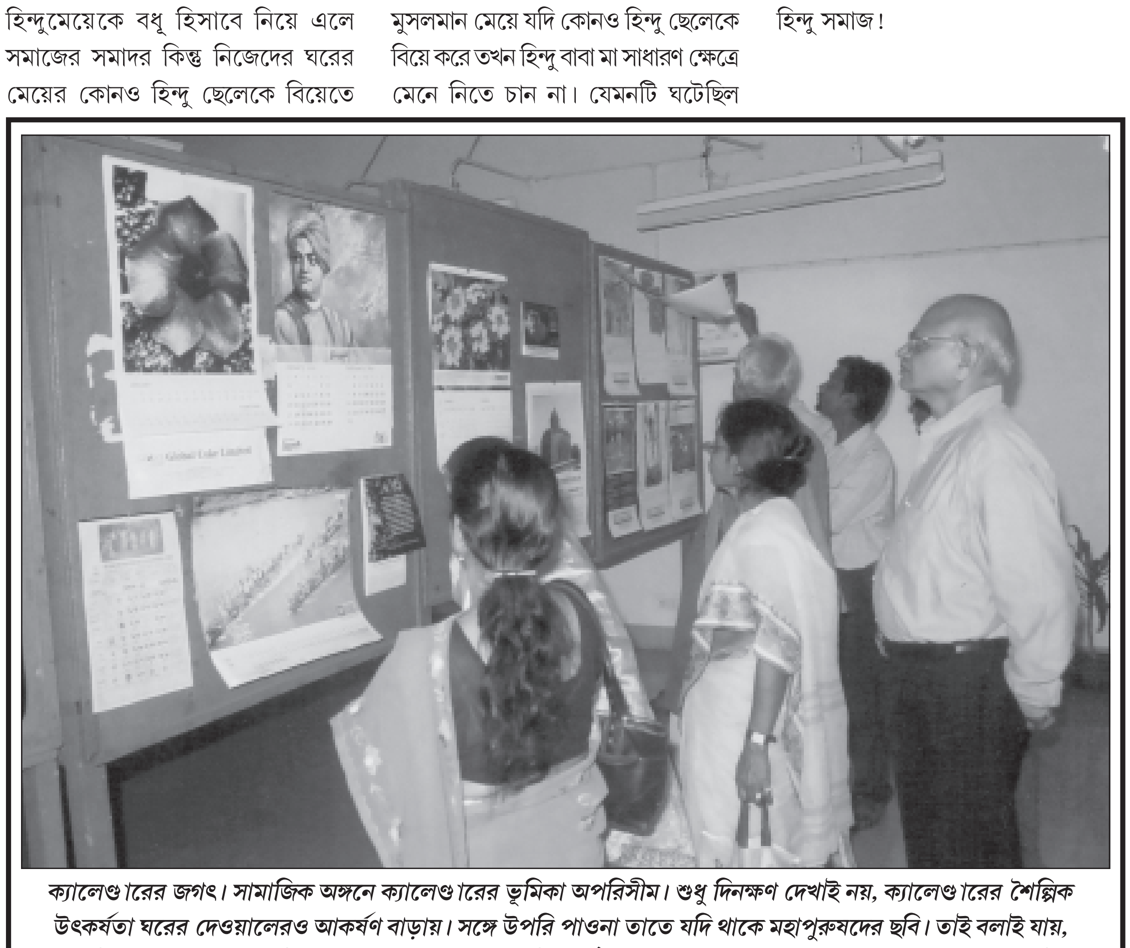

ক্যালেণ্ডারের জগৎ। সামাজিক অঙ্গনে ক্যালেণ্ডারের ভূমিকা অপরিসীম। শুধু দিনক্ষণ দেখাই নয়, ক্যালেণ্ডারের শৈল্পিক উৎকর্ষতা ঘরের দেওয়ালেরও আকর্ষণ বাড়ায়। সঙ্গে উপরি পাওনা তাতে যদি থাকে মহাপুরুষদের ছবি। তাই বলাই যায়, নয়নাভিরাম দৃশ্যের সঙ্গে ভক্তিরসের ধারায় আপ্লুত হবার চিরশ্রেষ্ঠ পন্থা বোধহয় এই ক্যালেণ্ডারই। কলকাতায় আয়োজিত ৫৬তম আন্তর্জাতিক ক্যালেণ্ডার প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য। — ছবি ঃ শিবু ঘোষ

পরম্পরা

রামনবমী

সুব্রত চক্রবর্তী কৃত্যতীর্থ

জগৎপতি ব্রহ্মার কাছে একদিন সনক ঋষি এসে উপস্থিত হলেন। নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা কী কর্ম করার ফলে নবদুর্বাদলশ্যাম রামকে পুত্র হিসেবে পেয়েছিলেন তা বলুন। ব্রহ্মা বললেন—তুমি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করেছ। পূর্বে রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা একাগ্রচিত্ত হয়ে শিবদুর্গার মন্ত্র জপ করছিলেন। তাঁদের জপে তুষ্ট হয়ে শিব উপস্থিত হলেন। দশরথ বললেন—আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার সকল কর্ম সফল, আজ আমার চক্ষু সার্থক, যেহেতু আপনার দর্শন পেলাম। শিব বললেন—তোমার কি কামনা বল, আমি তা দেব। দশরথ বললেন—হে মহাদেব! আমি পুত্রহীন। সেজন্য বড় দুঃখ আমার। বহুদিন ধরে মনে মনে বিচার করে আপনার আরাধনা করছি। দয়াময় শিব সব শুনে বললেন—দশরথ! তুমি বংশযজ্ঞ কর, তাহলে জগৎপতি রাম কৌশল্যার গর্ভে তোমার পুত্র হয়ে জন্মাবেন। এই বলে শিব অন্তর্ধান হলেন। রাজা দশরথ শিবের মুখে তা শুনে খুব আনন্দের সঙ্গে রাণীর সাথে বংশযজ্ঞ করেছিলেন। যথাকালে কৌশল্যা গর্ভধারণ করলেন। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের নবমীর শুভদিনে শুভলগ্নে সাক্ষাৎ নারায়ণ রাম জন্মেছিলেন। পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত ওই তিথি শ্রীরামনবমী নামে বিখ্যাত। রামনবমীতে তাই যে কোনও কর্মের শুভ দিন। সেই মহাপুণ্যদিনে রামের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয়, তা অক্ষয় হয়ে থাকে। ওই দিনে ব্রহ্মত্ব লাভের কামনায় উপবাস, জাগরণ ও পিতৃতর্পণ অবশ্য কর্তব্য। ওই মহাপুণ্যদিনে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে দশমী পর্যন্ত রামমন্ত্র জপ করলে তাতেই পুরশ্চরণ করা হয়। দশমীতে বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণকে ভোজন দক্ষিণা দিলে রাম তার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন। যে রামনবমীতে আলস্যশূন্য হয়ে উপবাস করে সে আর মাতৃগর্ভে জন্মায় না, নিজেই রাম হয়ে যায়। শ্রীরামনবমী ব্রত পবিত্র হতেও পবিত্রতর। সব শুনে আনন্দিত মনে সনক ঋষি ব্রহ্মাকে বললেন—ব্রতের পূর্ব দিন স্নান করে একবার মাত্র নিরামিষ আহার করে রাত্রে ভূমিতে কুশের উপর শয়ন করতে হয়। পরদিন যথাবিধি সঙ্কল্প করে প্রতিমায়, ঘটে, পটে অথবা যন্ত্র বা শালগ্রামশিলায় তুলসী দিয়ে রামচন্দ্রের পূজা করলে কোটি কোটি গুণফল হয়। রামের পূজার পর প্রথমে কৌশল্যা এবং তারপর দশরথের পূজা করতে হয়। ব্রতের প্রধান সঙ্কল্প হবে এভাবে—

শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকামা শ্রীরামনবমীব্রতমহং করিষ্যে। মধ্যাহ্নকালে রামের জন্ম তাই সে সময়ে চিন্তা করতে হবে—পাঁচটি গ্রহ স্ব স্ব উচ্চস্থানে থাকলে, চন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি যোগ হলে, নবমী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, পুনর্বসু নক্ষত্রে, সূর্য মেষরাশিতে অবস্থান করলে সমস্ত রাক্ষসগণ কাষ্ঠ দগ্ধ করবার জন্য অযোধ্যারূপ অরণি কাষ্ঠের মধ্য হতে অচিন্ত্য শক্তি অনির্বচনীয় রামরূপ এক অগ্নি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর বাদ্যাদি করে রামকে মূলমন্ত্রে তিন বার ভক্তিসহকারে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়।

উক্তরূপে আটপ্রহরে আটবার পূজা করে রামায়ণ কথা শুনে নৃত্যগীত সহকারে রাত্রিযাপন করতে হয়। পরদিন প্রাতঃস্নান করে ভক্তি ও শক্তি অনুসারে পুনরায় রামকে পূজা করে দক্ষিণা অচ্ছিদ্রাবধারণ ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে নিজে পারণ করবে। যে এই কথা প্রত্যহ বিশেষতঃ পুণ্যদিনে শ্রবণ করে তার পুত্র হয়, প্রচুর ধন হয় এবং সে দেহান্তে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। সে যুদ্ধে শত্রুহন্তা ও সর্বত্র বিজয়ী হয়।

স্মার্ত রঘুনন্দন রামনবমী ব্রত প্রসঙ্গে বলেছেন—চান্দ্র চৈত্র মাসের শুক্ল নবমীতে শ্রীরামনবমীব্রত করবে। এই ব্রতে উপবাস প্রধান। শ্রীরামপূজা প্রভৃতি তার অঙ্গ। এই ব্রত নিত্য ও কাম্য। তুলসী দ্বারা শালগ্রামকে শ্রীরামের পূজা করলে বেশি ফল হয়। এই নবমী তিথি পুনর্বসু নক্ষত্র যুক্ত হলে উত্তম। এই ব্রতে সঙ্কল্পাদির বেলায় 'শ্রীরামনবম্যাং তিথৌ' এরূপ উল্লেখ করবে।

যেদিন এই নবমী অখণ্ডা (এক দিন মাত্র ব্যাপিনী) হয়ে পুনর্বসু যুক্ত হবে সেদিনে শ্রীরাম নবমী ব্রত করতে বলা হয়েছে। নবমী খণ্ডিতা হলে অর্থাৎ দুই দিন তিথি পেলে, একাদশীর দিনে দশমী পারণযোগ্য কাল পেলে অর্থাৎ পারণ করতে পারা যায় এমন একটু দশমী পেলে, অষ্টমী যুক্ত নবমী ত্যাগ করে দশমী যুক্ত নবমী খণ্ডে অর্থাৎ পরদিন মুহূর্তা ন্যূনকাল ব্যাপিনী নবমীখণ্ডে শ্রীরামনবমী ব্রত করতে হবে। একাদশীর দিনে দশমী পারণযোগ্য না হলে (দশমী একটুও না থাকলে) পুনর্বসুযোগ হউক বা না হউক, অষ্টমীযুক্ত নবমীখণ্ডে (পূর্ব দিনে) উপবাস ও শ্রীরামাদির পূজা করে পরদিনে দশমী পারণ করতে হবে। দশমীতেই পারণ করা কর্তব্য এবং এটাই নিয়ম। এ প্রসঙ্গে অগস্ত্যসংহিতায় তাই প্রমাণ হিসাবে বলা হয়েছে—

চৈত্রে শুদ্ধা তু নবমী পুনর্বসুযুতা যদি
সৈব মধ্যাহ্নযোগেন মহাপুণ্যতমা ভবেৎ।
নবমী চাষ্টমী বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ
উপোষণং নবম্যান্তু দশম্যামেব পারণম্॥

কর্মযোগিনী বন্দনীয়া তাঈজী

(৬ পাতার পর)

জানতেন। ঘরের শূন্যতায় ভরা ভারী পরিবেশ থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাবার জন্য মৌসিজী এই কৌশল নিলেন। প্রবচনের দিনগুলিতে তাঈজীর মনের ঘা ধীরে ধীরে সারতে লাগল। এরপর মৌসিজী নির্দেশে তাঈজীও প্রবচন শুরু করলেন। ১৯৬৯-এ গীতাধর্ম মণ্ডলের মহিলা বিভাগে তাঈজী রামায়ণ পাঠ করলেন। তাছাড়া পুণের প্রবচনের পরই শুরু হলো পুণে ত্রৈবার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি। তাঈজীর কাছে শোকে মগ্ন হওয়ার ফুরসৎ রইল না। তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের কারণে সম্মেলনে যেন কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখলেন। পুণের যে কোনও কাজে অনুশাসন ছিল দেখার মতো। এই সম্মেলনেও ঘর ঘর থেকে সংগ্রহ করা রুটি এনে ভোজনের ব্যবস্থা হলো।

পুণে সম্মেলনের পর কেন্দ্রীয় বৈঠকে তাঈজী অখিল ভারতীয় প্রমুখ কার্যবাহিকার দায়িত্ব পেলেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে হোত। এসময় সবচেয়ে সমস্যায় পড়লেন ভাষা নিয়ে। এতদিন পুণের বিশুদ্ধ মারাঠি পরিবেশ থেকে বেড়িয়ে হিন্দি বলা বেশ কঠিন ছিল। প্রথম প্রথম ভুলচুক হোত। ধীরে ধীরে হিন্দি ভাষা আয়ত্ত হতে লাগল। ১৯৭১ গোয়ালিয়রে সম্মেলন হলো। মহারাষ্ট্রের বাইরে প্রথম সম্মেলন। তাঈজী ক্রমশ ভ্রমণে অভ্যস্ত হতে লাগলেন। যারা তাঈজীকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তারা জানতেন, সেখানেই যেতেন, তার ব্যাগে কি না থাকত। নানারকম ওষুধ, জড়িবুটি, কখন কার কি কাজে লাগে, সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। প্রতিটি কাজ এত আন্তরিক ও সুচারু ভাবে করতেন, যাতে সকলেই প্রভাবিত হত।

পূজনীয় শ্রীগুরুজীর সঙ্গে আপ্টে পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল। গুরুজী বলতেন, তাঈজী, আপনার মতো বাড়ি সব জায়গায় হওয়া চাই। কেননা কাপপ্লেটের শব্দে বৈঠক মুখরিত হয়। বেশ কয়েক বছর বাদে গুরুজী তাঈজীকে একদিন বলছিলেন, "সমিতির কাজ এখন অনেক বেড়েছে। কারণ কাপ-প্লেটের শব্দ ছাড়াই, চা পাওয়া যাচ্ছে।" বড় ভাই-এর মতো শ্রীগুরুজীও একদিন ক্যানসার রোগে চিরবিদায় নিলেন। এই আঘাত তাঈজীকে গুরুতর আহত করল।

১৯৭৪-এ দিল্লিতে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ছিল। এই সম্মেলন সফল করতে সিন্ধুতাঈ-এর সহযোগিতা করার জন্য দিল্লিতে চলে এলেন। সম্মেলন সফল হলো। কিন্তু এই সময়টা পুণের জন্য ভাল ছিল না। পুণের আকাল শুরু হল। সামান্য খাদ্যের জন্য মানুষ দরজায় দরজায় ফিরতে লাগল। এই অবস্থায় তাঈজী তাঁর যথাসাধ্য সামর্থ্য নিয়ে পুণের রাউতবাড়ি গ্রামের দায়িত্ব নিলেন। তাদের জন্য খাবার, জামাকাপড়, ওষুধ সংগ্রহ করে বিতরণ করা, সান্ত্বনা দিয়ে পাশে দাঁড়ান। শিশুদের জন্য সংস্কার বর্গ শুরু করেন। রাস্তা বানাতে সহায়তা করেন। তিন বছর বাদে বর্ষা এলে, আকাল কাটল। কিন্তু রাউতবাড়ির মানুষ চিরদিন তাদের মাতৃস্বরূপ তাঈজীকে ভোলেনি। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা জারী হলো। সামান্য সন্দেহে সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জেলে পুরতে লাগল। গোটা দেশ যেন জেলখানায় পরিণত। সংঘের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা জেলে বন্দী। তাঈজী বাড়িতেও সবসময় ছদ্মবেশে পুলিশের লোকজন আসত। তিনি তাদের চিনতেন। শান্তভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঈজীর পরিবার তখন ছাপাখানার উপর নির্ভরশীল ছিল। জরুরী অবস্থায় ছাপাখানার উপর সরকারের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। ফলে তাঁর দুই জামাইকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। মিসা আইন বন্দী মানুষদের মিসাবন্দী বলা হোত। তাঁদের মুক্তির জন্য দিকে দিকে স্লোগান উঠতে লাগল। আচার্য বিনোবা ভাবে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নিকট জন। বিনোবাজীর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধিকে যদি বোঝানো যায় তাহলে ফল মিলতে পারে, এই আশায় একটি প্রতিনিধিমণ্ডল, বিনোবাজীর কাছে গেলেন। এই দলে মৌসিজী, তাঈজীও ছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। কারণ সেদিন বিনোবাজীর মৌনব্রত ছিল। জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে সমিতির কাজ অন্যরূপে চলতে থাকে। ৭৭ সালের ২২ মার্চ সংঘের কার্যকর্তারা মুক্তি পেলেন। সংঘ ও সমিতির কাজ পুনরায় জোরকদমে চলতে লাগল। ১৯৭৮ সালে তাঈজী আবার অভিভাবকহীন হলেন। বন্দনীয়া মৌসিজীর পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। একাধারে মা, পথপ্রদর্শক, বা জীবন পথের দিশারী অনন্ত কার্যভার তাঁর সহনশীল স্কন্ধে অর্পণ করে গেলেন। বন্দনীয়া মৌসিজীর ইচ্ছানুসারে তাঈজী প্রমুখ সঞ্চালিকার স্থলাভিষিক্ত হলেন। এতদিন মাথার উপর মৌসিজী ছিলেন। এখন সেই দায়িত্বটাই তাঁর উপর। অখিল ভারতীয় বৈঠকে প্রচার অভিযানের জন্য স্থির হলো মৌসিজীর স্মৃতিদিন সম্পর্ক দিন রূপে মানা হবে। সেদিন সকলেই যত বেশী সংখ্যক নতুন সম্পর্ক গড়ে তাদের শাখায় আনবে। এভাবে কাজও বাড়বে। তাঈজী মনে করতেন শাখা সঞ্জীবনী, শাখায় এলে মনের বিষণ্ণতা কাটে, নতুন উদ্যম আসে। তাই সবসময় চেষ্টা থাকত কোনও না কোনও শাখায় উপস্থিত থাকা। একজন কার্যকর্ত্রীর যথার্থ কাজের ফল হলো প্রভাবী শাখা। শাখা সচল রাখতে প্রয়োজন আত্মিক সম্পর্কের। সম্পর্কের উপর জোড় দিতে তাঈজীর একটি মাধ্যম ছিল রাখি। যেখানেই যেতেন সঙ্গে রেশম, লালসুতো কাঁচি থাকত। কথা বললেও হাত চলত রাখী বাঁধতে। পরিচিতজনকে মনে রাখতে রাখী পাঠাতেন। এমন হয়েছে সেবিকারা এর-ওর নাম করে তাঈজীর বানানো রাখি নিয়ে যেতেন। এতদিনে সমিতির কাজের আরও বিস্তার হয়েছে। শ্রীশক্তিপীঠ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভজন মণ্ডল, জীজামাতা স্মারক সমিতির মতো পার্শ্বসংস্থা গড়ে উঠেছে। নাসিকে রাণী ভবন, বনবাসী কন্যা ছাত্রাবাসের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। ১৯৮৪ সালে তাঈজীর ৭৫ বছর পূর্ণ করলেন। বয়স হলেও সুস্থ ছিলেন। তবু কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহ-প্রমুখ সঞ্চালিকার পদ সৃষ্টি করে শ্রীমতী ঊষাতাঈ চাটিকে সেই পদে মনোনীত করলেন। সেই বছরই দেবী অহল্যা মন্দিরে ছাত্রাবাস শুরু হলো। তাঈজী ঊষাতাঈজীকে অহল্যা মন্দিরে সর্বক্ষণ থেকে কাজ করার প্রস্তাব দিলেন। ঊষাতাঈজী অহল্যা মন্দিরের দায়িত্ব নিলেন।

তাঈজীর আরও একটি অনন্য কাজ পৌরহিত্য বর্গের সূচনা। ১৯৮৩ সাল থেকে সমিতির কিছু মহিলাদের পূজা, যজ্ঞ শেখানোর জন্য বর্গের আয়োজন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। সেদিন থেকে আজও সেই কাজ চলছে। তাঈজীর কার্যকালেই সমিতির কর্মকাণ্ড সমুদ্রপার করে ইংলন্ডে সূচনা হয়। ১৯৮৯ সালে ইংলণ্ডে হিন্দু সম্মেলনের পর বিশ্ব সেবিকা সমিতির নামে কাজ শুরু হয়। অখণ্ড কার্যধারা অবশেষে শেষ হয় ১৯৯৩ সালের মার্চ। তিলক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে সেদিনই ছিল তাঁর জন্মতিথি। তিথি নিজেও দিনলিপিতে নিজ মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সজ্ঞানে, নিজ কর্তব্য করতে করতে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। একটি নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের সমাপ্তি ঘটল।

বোধ কথা

মনুষ্য-প্রকারভেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একদিন তাঁর ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে কলকাতার দিকে আসছিলেন। পথে এক জায়গায় দেখলেন কয়েকজন জেলে একটা পুকুরে মাছ ধরছে। জালে আটকে পড়া মাছগুলির দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। শিষ্যরাও মাছগুলোর লম্ফ-জম্ফ দেখে হাসতে লাগল। শিষ্যরা দেখল কতগুলো মাছ নানাভাবে জাল থেকে বেরোবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কতগুলো মাছ আবার জলের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে আছে। মাছগুলো বেঁচে আছে না মরে গেছে তা বোঝা দায়। এরই মধ্যে আবার এক-আধটা মাছ জাল থেকে লাফিয়ে পালিয়েও যাচ্ছে।

পরমহংসদেব এসব দেখতে দেখতে তাঁর শিষ্যদের বললেন, মাছ আর মানুষের জীবনে বেশ মিল। তাঁর কথা শুনে ভক্তরা খানিকটা অবাক হলেন। ঠাকুরের কাছে তারা

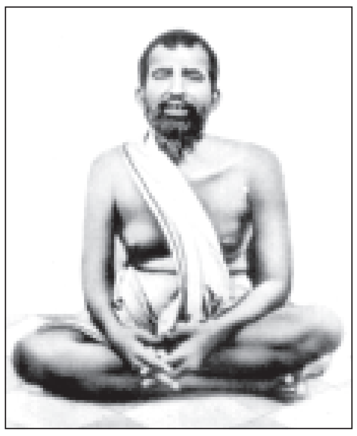

এর কারণ জানতে চাইলে ঠাকুর বললেন, দেখ, একরকমের মানুষ আছে যারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ—আত্মকেন্দ্রিক। এই ভব-সংসারে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। আবার আর এক রকমের মানুষ আছে যাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই। আর কিছু প্রকার মানুষ আছে যারা প্রচণ্ড ইচ্ছা ও সাধনার মাধ্যমে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। এই শুনে এক শিষ্য বলে উঠলেন, ঠাকুর, আর এক শ্রেণীর কথা আপনি বললেন না।

ঠাকুর খানিকটা হেসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আর এক প্রকার মানুষ আছে ওই মাছেদের মতন যারা জালের নিকটেই যায় না। ফলে তাদের জালে ফাঁসবার কোনও প্রশ্নই থাকে না।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সামান্য সামান্য ঘটনার উদাহরণ দিয়ে নানা রকমের মানুষের কথা তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কাছে তুলে ধরতেন।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ৪

গয়াতে 'বিষ্ণুপাদ' দর্শন করে তাঁর মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল।

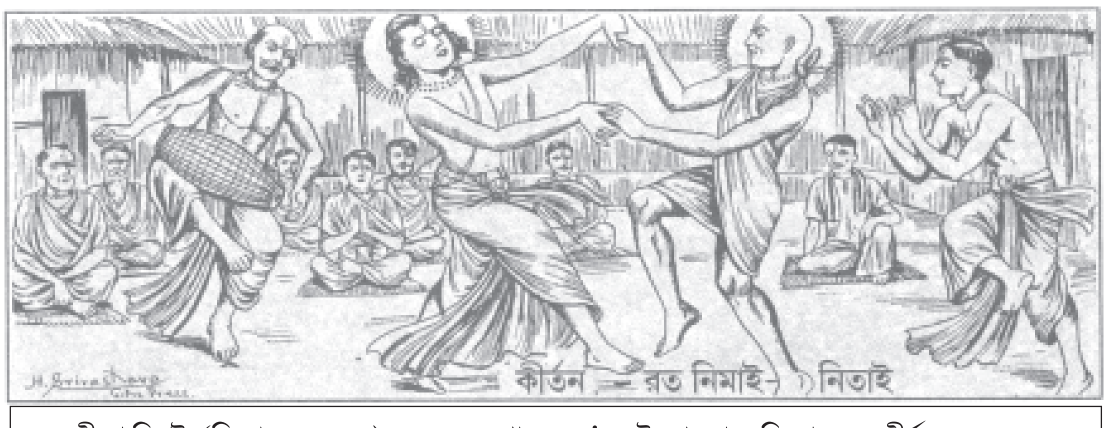

নবদ্বীপে নিমাই (নিত্যানন্দ অবধূত)-এর সঙ্গে দেখা হলে দু'জনেই প্রেমভাবে বিভোর হয়ে কীর্তনে রত হলেন।

জগাই-মাধাই মদের হাঁড়ি ছুঁড়ে মারলেও নিমাই-নিতাই তাদের ভালোবেসে জড়িয়ে ধরলেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

ফুলের রঙ-রহস্য

কোনও ফুলকে লাল দেখায়, তার কারণ ওই ফুল সূর্যকিরণের লাল ছাড়া আর সব কটি রঙ (বেগুনি, আশমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, নীল) শোষণ করে নেয়। লাল রঙকে ওই ফুল ফিরিয়ে দেয় আর সেই জন্যই ফুলটিকে লাল দেখায়। এই রঙ ফিরিয়ে দেওয়ার রহস্য কী? সাম্প্রতিক গবেষণায় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, ফুলের পাপড়িতে এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু থাকে, যার নাম অ্যানথোসায়ানিন (Anthocyanin)। এই রাসায়নিক বস্তুটি ফুলের পাপড়িতে খুবই অল্প পরিমাণে থাকে, তা সত্ত্বেও ফুলে বিভিন্ন রঙ সৃষ্টি করতে পারে। লাল গোলাপ বা লাল ডালিয়ার মধ্যে যে-অ্যানথোসায়ানিন থাকে তার নাম সায়ানিডিন। তেমনি গোলাপি ও নীল ফুলের পাপড়িতে থাকে ডেলফিনিডিন। সায়ানিডিন ও ডেলফিনিডিন অণুর গঠনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেবল ডেলফিনিডিনের মধ্যে একটি অক্সিজেন পরমাণু বেশি থাকার ফলে একটি পাপড়ি হয় লাল, অন্যটির রঙ গোলাপি ও নীল। এরকম নানা ধরনের অ্যানথোসায়ানিন রয়েছে বিভিন্ন ফুলের মধ্যে, তারাই ফুলের রঙ নির্দেশ করে।

ত্বকের কোষ থেকে ইঁদুর

আণুবিক্ষণিক একটি ছোট্ট কোষ থেকে আস্ত একটি প্রাণী সৃষ্টি! হ্যাঁ, এমনটাই সম্ভব করেছেন চৈনিক গবেষকেরা। ত্বকের বিশেষ কোষ ইনডিউস্‌ড প্লুরিপোটেন্ট স্কিন সেল (IPL)-কে ভ্রূণজ স্টেম্ সেল-এ পরিবর্তন করে পূর্ণাঙ্গ ইঁদুর তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। এর জন্যে তাঁরা এক বয়স্ক ইঁদুরের ভ্রূণের ত্বক ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে সেই কোষ থেকে ভ্রূণ করে তৈরি একটি স্ত্রী-ইঁদুরের দেহে স্থাপন করে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ইঁদুর পান। ভবিষ্যতে স্টেম্ সেলের এমন ব্যবহার মানুষের ক্ষেত্রেও সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে চিউয়িং-গাম

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে চিউয়িংগাম, চকোলেট। রক্ত পরীক্ষার বদলে চিবোনো বিশেষ উপাদানে তৈরি চিউয়িংগামই জানাতে পারে শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর অস্তিত্ব। ওই জীবাণুর ওপর চকোলেটের প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ওয়াশিংটনের মাইক্রোসফট্ প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস্ এটি আবিষ্কার করেছেন।

কৃত্রিম মস্তিষ্ক

প্রতিযোগিতার বাজারে আর এঁটে ওঠা যাচ্ছেনা! প্রায়ই মনে হয়, মস্তিষ্কটা যদি আরও বুদ্ধি ধরতে পারত! এও সম্ভব হতে চলেছে। হৃদযন্ত্রের জন্যে যেমন পেসমেকার, লন্ডন লাউস্যানের 'ব্রেন মাইন্ড ইনস্টিটিউট'এর অধ্যাপক হেনরি মারক্রামের আবিষ্কার তেমনি এক কৃত্রিম মস্তিষ্ক। সিলিকন, সোনা ও তামা দিয়ে তৈরি এই মস্তিষ্কটি চতুরতায় থাকবে যোজন-ক্রোশ এগিয়ে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 'ব্লু ব্রেন' নামের এই মস্তিষ্ক মানুষের নাগালের মধ্যে এসে যাবে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ বাংলা ব্যাকরণে ধাতুরূপ কাকে বলে?

ছাত্র ঃ যে চ্যাপ্টারগুলো খুব শক্ত তার সবগুলোই ধাতুরূপ স্যার।

* * *

রোগী ঃ জীবনের বেশির ভাগ আয়ই ডাক্তারের পেছনে খরচ করেছি! আর পারছিনা।

ডাক্তার ঃ ইস, আপনি আগে কেন আমার কাছে এলেন না!

* * *

পরিবেশবাদী ঃ বিটি-বেগুন দূর হটো, দূর হটো।

নারীবাদী ঃ এসব জেন্ডার-বায়াস চলবে না। বিটি-বেগুন ব্যাটা-বেগুন সবই হটাতে হবে।

* * *

ছেলে ঃ মা, তোমার মাথায় কয়েকটা চুল সাদা কেন?

মা ঃ হবে না! যখনই তুই দুষ্টুমি করিস, আমার একটা চুল সাদা হয়ে যায়।

ছেলে ঃ বুঝেছি, তুমি এমন দুষ্টুমি করতে যে দিদার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে।

* * *

রোগী ঃ ডাক্তারবাবু, আপনার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এক শিশি ওষুধ কিনে শিশির গায়ে লেখা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, কিন্তু সুস্থ হলাম না তো!

ডাক্তার ঃ কী নির্দেশ ছিল শিশির গায়ে?

রোগী ঃ টাইট্ দ্য কর্ক ওয়েল অ্যান্ড কীপ ইন ডার্ক প্লেস। ভুল করেও শিশির কর্ক খুলিনি।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'—এই শিশুকাব্যের রচয়িতা কে?

২। পৃথিবী থেকে চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর মতো দেখতে যে সুপার গ্রহের খোঁজ মিলেছে তার কী নাম দেওয়া হয়েছে?

৩। স্নুকার খেলায় কোন্ রঙের বল মারলে বা পকেট করলে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া যায়?

৪। ১৯৯৯ সালে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ইউনেস্কো কোন্ তারিখটি ঘোষণা করেছিলেন?

৫। কমিক চরিত্র টারজানের স্রষ্টার নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২। গ্লিজে ৫৮১ সি

৩। কালো বল

৪। ২১ ফেব্রুয়ারি

৫। এডগার রাইস বারোজ

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের জন্মদিবস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ সংঘচালক প্রয়াত ব্রঃ জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বারহাট্টা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সারাদিন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ তপন ভড় তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে স্মৃতিচারণ করেন। লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় মোট ৪৫ জন রক্তদান করেন। ৫৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা এবং ৩৮ জন রোগীর ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া ডাঃ জয় ব্যানার্জীর মাধ্যমে ১৫ জন রোগীর নিউরোথেরাপী চিকিৎসা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, ডাঃ বনমালী ভড়, ডঃ জিতেন্দ্র নারায়ণ সিংহরায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অদ্বৈত নাথ দে।

হোমিও চিকিৎসা শিবির

উত্তর মালদা সেবাভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হ'ল স্বাস্থ্য শিবির। গত ৭ মার্চ রবিবার মালতীপুর খণ্ডের মহদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে দরিদ্র ও বনবাসী পরিবারের ৯৮ জন রোগী তাদের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেন। সেবা ভারতীর আরোগ্যরক্ষকগণ এই নিঃশুল্ক শিবিরে চিকিৎসা করেন।

মালদায় হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন

হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান, গত ৬ ও ৭ মার্চ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে ভজন, কীর্তন, আত্মরক্ষামূলক লাঠি-ছোরা খেলা, আদিবাসী নৃত্যগীত, শ্রীশ্রীগুরু পুজো আরতি, শিব পূজারতি, বৈদিক শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

উক্ত ধর্মীয় সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী মহারাজ, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিকাশ সাহা (প্রকল্প আধিকারিক ও জেলা কল্যাণ আধিকারিক, অনুন্নত সম্প্রদায়, মালদা)।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন—শ্রীমৎ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ, বেলডাঙ্গা আশ্রম), অদ্বৈত চরণ দত্ত (প্রান্ত প্রচারক, উত্তরবঙ্গ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)। এছাড়াও কয়েকটি আশ্রমের অধ্যক্ষ, স্বামীজীরাও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ম সম্মেলনের মঞ্চ পরিচালনা করেন শ্রীমৎ স্বামী করুণানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ, উত্তর-পূর্বাঞ্চ ল ক্ষেত্র অসম)।

ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল-এর কার্যক্রম

দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটির উদ্যোগে ৬ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অর্ন্তগত ডায়মণ্ডহারবারের অধীন 'গিলারচেট' এবং 'বেলপুঞ্চু রিয়া' গ্রামে ৩০তম বর্ষ শিশু ও কিশোরদের উৎকৃষ্ট ও গুণগতমান-এর শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা), নারী ক্ষমতা উন্নয়ন, নারী স্বনির্ভর রোজগার বিশেষ শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩৫০ জন (তিনশত পঞ্চাশ) জন নারী ও শিশু অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মিশনের উদ্যোগেই ৭ মার্চ, হাওড়া জেলার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুরের অধীন 'পাতিহাল' এবং 'শঙ্করহাটি' গ্রামে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, যৌন শোষণ, নিষিদ্ধ পল্লীর শিশুদের বিশেষ শিক্ষা, পুনর্বাসন শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩৭৫ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। ৮ মার্চ, নদীয়া জেলার অর্ন্তগত কৃষ্ণনগরের অধীন 'বাগবেড়িয়া' এবং 'ফকিরভাষা' গ্রামে শিশু

সমাবেশ সমাচার

ও কিশোরদের পুষ্টি, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, পণপ্রথা প্রতিরোধ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩৮০ (তিনশত আশি) জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন।

কোচবিহারে চিলা রায়ের নামে সেবাকেন্দ্র

গত ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে 'বীর চিলারায় হোমিও চিকিৎসালয়' নামে একটি নিঃশুল্ক সেবাকেন্দ্র শুরু হয় কোচবিহার নগরের স্থানীয় হাজড়া পাড়া শ্মশান কালীবাড়ী ক্লাব প্রাঙ্গণে। এই সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসা করবেন ডঃ শঙ্কর দাস।

সেবাকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতমাতা ও বীরচিলা রায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগের বিভাগ প্রচারক গণেশ চন্দ্র পাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক নরেন বেরা, জেলা কার্যবাহ গৌতম রায়, সুনীল দাস, মৃণাল সিংহ, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গণেশ চন্দ্র পাল, ডঃ নৃপেণ পাল ও ডাঃ শঙ্কর দাস। কোচবিহার নগরের সেবা প্রমুখ সুব্রত শর্মা পুরকায়স্থ জানান যে, কোচবিহার নগরের অনুন্নত এলাকায় এরকম সেবাকাজ, যেমন অর্শ চিকিৎসা কেন্দ্র, রক্তদান শিবির অদূর ভবিষ্যতে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ওই দিন দুঃস্থ রোগীদের মধ্যে ছয়জনের চিকিৎসা করা হয়। প্রতি রবিবার সকাল ১০টা-১২টা পর্যন্ত এই সেবাকেন্দ্রে রোগী দেখা ও ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

ময়ূরেশ্বরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি পালন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বীরভূমের ময়ূরেশ্বর শাখার উদ্যোগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫২৫তম আবির্ভাব বর্ষ পালিত হলো। এই উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তনের একটি দল গ্রাম পরিক্রমা করে।

পরিক্রমার শেষে উত্তর বীরভূম জেলার সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ কৃপাসিন্ধু মণ্ডল বলেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবত্ব ও মানবত্ব-এর যুগলবিগ্রহ। আজ থেকে ৫২৫ বছর আগে বাংলার নবদ্বীপে জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শোক সংবাদ

হুগলি জেলার কাপাসডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক বলরাম দাস ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৮ জানুয়ারি ৫১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত ছিলেন এবং '৭৫-'৭৭-এর জরুরি অবস্থার সময় কারাবরণ করেন। তাঁর মা, স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান।

☛ ☛ ☛

দ্বারহাটা শাখার প্রথম মুখ্যশিক্ষক পঞ্চানন কুঁকড়ীর বাবা হারাধন কুঁকড়ী গত ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যাসহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

☛ ☛ ☛

দক্ষিণ বীরভূম জেলার প্রচার প্রমুখ সুনীল বিষ্ণুর মেজবৌদি প্রমীলা বিষ্ণু গত ৮ মার্চ সন্ধ্যায় সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

☛ ☛ ☛

হাওড়া জেলার কার্যবাহ তাপস ভট্টাচার্যের মাতৃদেবী কল্যাণী ভট্টাচার্য গত ১০ মার্চ সকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর দুই পুত্র, দুই কন্যাসহ নাতি-নাতনিরা বর্তমান।

সেবাভারতীর স্বাস্থ্য শিবির

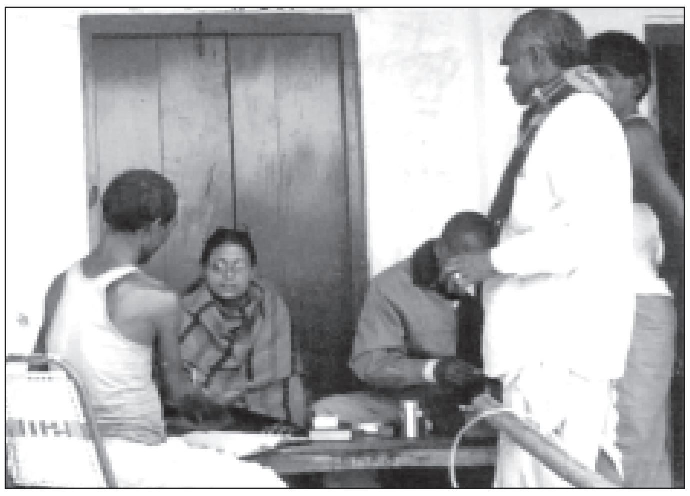

গত ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলায় সেবাভারতীর মাথাভাঙ্গা শাখার উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। হাজরাহাট অঞ্চ লের পক্ষীহাগা হুড়কাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই শিবির শেষ পর্যন্ত মেলার রূপ ধারণ করে।

এই শিবিরে একইসঙ্গে আলাদা আলাদা টেবিলে চলে নিঃশুল্ক হোমিওচিকিৎসা। সেখানে ২৩৭ জন রোগী তাদের চিকিৎসা করান, অন্য টেবিলে চলে রক্তের শ্রেণী (ব্লাড-গ্রুপ) নির্ণয় যেখানে ৭০ জন তাদের রক্ত-শ্রেণী নির্ণয় করিয়েছেন। আর এক টেবিলে চলে রক্তচাপ নির্ণয় সেখানে ৯০ জনের রক্তচাপ মাপা হয়। এছাড়াও শতাধিক ব্যক্তিকে রোগ নির্ণয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এলোপ্যাথি প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়। এই শিবিরে হোমিও চিকিৎসা করেন আরোগ্যরক্ষক মনু বসাক এবং মনোরঞ্জন সরকার, সহকারী হিসেবে ছিলেন বিকাশ সরকার। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ গৌতম সরকার। এই শিবির পরিচালনায় অংশ নেন সাধন পাল (বিভাগ সেবা প্রমুখ)। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রচারক অঙ্কুর সাহা।

শ্যামপুরে প্রথম সংস্কৃত শিবির

হাওড়া জেলার শ্যামপুরে প্রথম সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির-এর আয়োজন করল সংস্কৃত ভারতী। ভগবানপুর সিদ্ধেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে দশদিনের এই শিবির (১০ ফেব্রুয়ারি—২০ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। গান, গল্প, খেলা ও অভিনয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার এক অভিনব পদ্ধতি শেখানো হয়। শিবিরের সমারোপ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার আচার্য, শ্যামপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসেনজিৎ নিয়োগী, আনন্দমার্গ মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার বৈতালিক, বাগনান টেপুর স্কুলের শিক্ষক সমীরণ রায় প্রমুখ। সংস্কৃত ভারতীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্যামপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক মধুসূদন জানা, সকলেই সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে চালু করার উপর বিশেষ জোর দেন। শিক্ষক হিসাবে সম্পূর্ণ শিবির পরিচালনা করেন সংস্কৃত ভারতী বাগনান মহকুমার কার্যকর্তা বিশ্বজিৎ প্রামাণিক।

রঙ্গম

শতবর্ষের আলোয়

নট-নাট্যকার ও নির্দেশক মহেন্দ্র গুপ্ত

বিকাশ ভট্টাচার্য

স্বল্পবিলাসী কাব্য ও সঙ্গীত অনুরাগী দেবেন্দ্রনাথ চারদিনের জ্বরে মাত্র চল্লিশ বছর

মহেন্দ্র গুপ্ত

বয়সে দুই পুত্র, তিনকন্যা ও স্ত্রীকে রেখে প্রয়াত হন। মহেন্দ্র গুপ্ত তখন দশ বছরের বালক, যিনি অচিরেই সংসারের হাল ধরবেন।

বাংলা পেশাদার মঞ্চে র সফল নাট্যব্যক্তিত্ব মহেন্দ্র গুপ্ত ২৭ জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার দুলালীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গত ২৭ জানুয়ারি ২০১০ তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল ষ্টার থিয়েটারে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে র গৌরবের মূলে ছিল মহেন্দ্র গুপ্তের নিরলস সাধনা। সাময়িক ছেদ পড়লেও পরে ১৯৭৫ সালে তিনি আবার ষ্টারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের ১১ জানুয়ারি কয়েকশত রজনী অতিক্রান্ত 'সমাধান' নাটকে অভিনয় করার সময় পর্যন্ত তিনি ওই মঞ্চে র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যৌবনকালে যে ষ্টার রঙ্গ মঞ্চ থেকে তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা, আজীবন নাট্যসাধনায় ব্যাপৃত থেকে সেই মঞ্চ থেকেই তাঁর শেষ বিদায়। সুতরাং এই নাট্যনিবেদিতপ্রাণ মানুষটির জন্মশতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ষ্টার রঙ্গমঞ্চে আয়োজন করে উদ্যোক্তারা সঠিক কাজই করেছেন। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে ই "মহেন্দ্র গুপ্ত নাট্যসমগ্র" লোকার্পিত হ'ল। লোকার্পন করলেন আর এক নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম পর্যায়ে মোট তিনটি খণ্ডে এই নাট্যসমগ্র প্রকাশিত হ'ল। প্রথম খণ্ডে পৌরাণিক, দ্বিতীয় খণ্ডে ঐতিহাসিক ও তৃতীয় খণ্ডে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে চতুর্থ খণ্ড—যাতে আছে তাঁর লেখা মৌলিক সামাজিক নাট্যসমগ্র। প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা ইভা গুপ্তপাণি। বিবাহসূত্রে এখন যিনি জামশেদপুরের বাসিন্দা।

উত্তরাধিকার

নাট্যাভিনয় ও নাট্যরচনার যে আবেগ মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর রক্তে ধারণ করেছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথের প্রধান আবেগ ছিল নাট্যাভিনয়। ফরিদপুরের টাউন থিয়েটারে তখন অপেশাদার নাট্যচর্চা চলত। এই ড্রামাটিক ক্লাবের তিনি ছিলেন কর্মবীর। এই স্বল্পবিলাসী কাব্য ও সঙ্গীত অনুরাগী দেবেন্দ্রনাথ চারদিনের জ্বরে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে দুই পুত্র, তিনকন্যা ও স্ত্রীকে রেখে প্রয়াত হন। মহেন্দ্র গুপ্ত তখন দশ বছরের বালক, যিনি অচিরেই সংসারের হাল ধরবেন।

প্রথম নাট্যসৃজন

রাজেন্দ্র কলেজে মহেন্দ্র যখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখন লেখেন তাঁর প্রথম নাটক 'উত্তরা'। অবশ্য এর আগেই কলকাতায় আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। মিনার্ভায় অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' এবং নাট্যমন্দিরে শিশির কুমার ভাদুড়ির 'রমা' দেখেছেন। নাটক অভিনয়ের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রথম নাটক 'উত্তরা' নিয়ে কলকাতার হল-মালিকদের তেমন মাথা-ব্যাথা ছিল না। প্রায় হতাশ মহেন্দ্রকে উৎসাহিত করে স্বয়ং বংশীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ি ডেকে পাঠালেন। তাঁর স্বপ্নের কলকাতার প্রবল টানে এম. এ পড়তে চলে এলেন। কলকাতার নাট্যব্যক্তিত্বদের সাহচর্যে উৎসাহিত মহেন্দ্র লিখে চললেন একটার পর একটা নাটক। ১৯৩৭ সালের ১৮ জুন তাঁর পৌরাণিক নাটক 'গয়াতীর্থ' মিনার্ভায় মঞ্চ স্থ হ'ল। সেটিবিপুল জনসমাদরও লাভ করল। মহেন্দ্র সে সময় জীবিকার প্রবল তাগিদে এক জার্মান বীমা কোম্পানীর সামান্য কেরাণীর চাকরী নিয়ে দিল্লীতে। মন তাঁর টেকে না। নির্মলেন্দু লাহিড়ী গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে মহেন্দ্রকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনলেন। ১৯৩৮ সালে ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। আর পিছন ফিরে তাকাননি। ১৯৫২ পর্যন্ত রাতের পর রাত জেগে রচনা করেছেন অজস্র নাটক। চক্রধারী, উষাহরণ, কমলে কামিনী, শকুন্তলা, সারথি শ্রীকৃষ্ণ—পৌরাণিক; সিংহগড়, সুলতানা রিজিয়া, সিরাজদ্দৌল্লা, বিজয়নগর, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত—ঐতিহাসিক এবং নৌকাডুবি, কালিন্দী, শতবর্ষ আগে প্রভৃতি তাঁর জনপ্রিয় নাট্যরচনার কয়েকটি মাত্র। এক স্মৃতিচারণায় তিনি জানিয়েছিলেন তখনকার দিনে একটি নাটক বেশীদিন অভিনীত হোত না। সেল পড়ে গেলেই নতুন নাটকের তোড়জোর শুরু হয়ে যেত। এভাবে বছরে তিন-চারটি করে নাটক প্রতি বৎসর তাঁকে লিখতে হোত।

অভিনয়

অবশেষে এমন একটা সময়ে এসে গেল দেশভাগ। স্বাধীনতার পূর্বাহ্ন, সামাজিক পরিস্থিতির প্রচণ্ড অস্থিরতায় অধিকাংশ থিয়েটারই পূর্বকালীন গৌরব বিচ্যুত। ঐতিহ্যমণ্ডিত ষ্টার থিয়েটারের নিয়মিত নাট্যসম্ভারের প্রায় সব দায়িত্বই তাঁর কাঁধে। মহেন্দ্র গুপ্ত অনুভব করলেন কেবলমাত্র নাট্যরচনা ও পরিচালনা করে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যাচ্ছে না। এবার নেপথ্যের অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। ১৯৪৭ সালে তাঁরই নাটক 'স্বর্গ হতে বড়'-র প্রধান চরিত্র অমরেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বলাবাহুল্য তাঁর নাট্যরচনা, পরিচালনার সঙ্গে মঞ্চে আত্মপ্রকাশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চে র আশীর্বাদ হয়ে এল। বাংলার নাট্যমোদীরা শুধু একজন অমিত শক্তিধর অভিনেতাকেই পেলেন না, সেইসঙ্গে পেলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের এক যোগ্য উত্তরসূরীকে। যিনি একাধারে নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক।

শব্দরূপ - ৫৪১

ভারতী চৌধুরী

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. করবীর বৃক্ষ, প্রথম দুয়ে ডাঙ্গা, তিনে মন্দ, ৫. এখানে নিষ্পত্তি করতে হবে, দুয়ে জননী, ৭. কেশী নামক দানবকে বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ এই নামে খ্যাত, ৯. সুতো কাটার সুপ্রাচীন যন্ত্র, ১১. ব্রহ্মার মানসপুত্র, স্বনামধন্য বৈষ্ণব ভক্ত বিশেষ, আগাগোড়া বৎসর, দুয়ে-চারে ঈঙ্গ সন্ন্যাসিনী, ১৩. অন্য নামে সমুদ্র, একে-চারে-পাঁচে বালা।

উপর-নীচ ঃ ২. এদের জনক-জননী রাম সীতা, ৩. নবমীর পরে আসে, ৪. সর্পদেবী, ইনি জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী, প্রথম দুয়ে হৃদয়, ৬. রাবণের এক অনুচর, তাড়কা রাক্ষসী-এর মাতা, সীতাহরণ কালে এই মায়াবী-র সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন রাবণ, ৮. তৎসম শব্দে অধিষ্ঠান, বাস, ১০. বটবৃক্ষ অন্য নামে, প্রথম দুয়ে রুধির, ১১. বায়ু, শমীবৃক্ষ, ১২. ভাগ্য, অদৃষ্ট।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৩৯

■	■	প্র	কা	রা	ন্ত	রে	■
■	■	■	ল	■	■	ব	■
শ্রী	শ	■	বে	দ	ব	তী	■
■	ব	গ	লা	■	কা	■	■
■	■	ণে	■	চো	ল	ক	■
■	দ	শ	হ	রা	■	দু	র্মা
■	ধী	■	■	বা	■	■	■
■	চি	ল	মী	লি	কা	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

সায়ন্তন রায়
বেলাঘাটা, কলকাতা-১০
সুমন বসাক,
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৪১ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ এপ্রিল, ২০১০ সংখ্যায়

বয়স যেখানে হার মেনেছে

বৈজয়ন্তীমালা বালি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রগাঢ় নিষ্ঠা, নিয়মিত অনুশীলন ও প্রকৃত শিক্ষা যে বয়সকেও হার মানায় তা দেখা গেল গত ৭ মার্চ কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে বৈজয়ন্তীমালার ভরতনাট্যম নৃত্যানুষ্ঠানে। সম্প্রতি ইন্দো-অকসিডেন্টাল সিমবয়েসিস্ (আই. ও. এস.) চারদিন ব্যাপী বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, পণ্ডিত রশিদ খাঁ, রাজন-সাজন মিশ্র, তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, আমান-আয়ান আলি খাঁন এবং শঙ্কর মহাদেবন প্রমুখ শিল্পীদের অনুষ্ঠানের পর চূড়ান্তদিনে মঞ্চে এলেন প্রায় সত্তর-উর্দ্ধ শিল্পী বৈজয়ন্তীমালা। কোনও নৃত্যনাট্য বা ব্যালে নয়, তিনি পরিবেশন করলেন ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী ভরতনাট্যম। যা দেখে কলকাতার ভরতনাট্যমের শিক্ষাগুরু থাঙ্কমনি কুট্টি, অবাক! উচ্ছ্বসিত! তিনি জানালেন, এই বয়সেও যে এমনভাবে ব্যাকরণসম্মত নাচ কেউ দেখাতে পারেন তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ১৯৫৪ সালে 'নাগিন' ছায়াছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি বোম্বেতে আসেন। তখনই তিনি দক্ষিণ ভারতে ভরতনাট্যমের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তারপর হিন্দী ছবির নায়িকা রূপে তিনি অজস্র ছবি করেছেন। বিয়ে করেছেন। চুটিয়ে সংসদীয় রাজনীতি করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল প্রেরণা ভরতনাট্যম্-এর চর্চা নিয়মিত করে গেছেন। প্রায় দু-দশক পরে কলকাতায় এসে বৈজয়ন্তীমালা বালি মাতিয়ে গেলেন দর্শকদের। অভূতপূর্ব এই নৃত্যানুষ্ঠানের কথা কলকাতা মনে রাখবে।

ফিরে দেখাঃ জ্যোতি বসু

সে এক জাতীয় বীরের কাহিনী (পর্ব - ৩)

বিশাখা বিশ্বাস

সে আসছে। নিশাবসানের বিদগ্ধ বিহঙ্গরাজি শিল্পে-সাহিত্যে গাইছে তার আগমনী গান, লাল শাসকের ত্রাস-উদ্ভূত ভীতি-বীভৎসার মধ্যেও বদলের বাতাস বয়ে এনেছে তার অঙ্গের সুবাস, মার্ক্সীয় শাসনের রাত্রিশেষের অরুণোদয়ে আলোকিত হয়ে গেছে তার আসার পথ। সে আসছে।...

কিন্তু ইনি কখন এলেন, কেমন করে এলেন ?—সংক্ষেপে বলা যায়, জরুরী অবস্থার অপচয়ে এমন একটি সময়ে তার রাজ্য লাভ যখন সারা ভারতজুড়েই পরিবর্তনের ঝড়, নতুন প্রত্যাশার স্বপ্নে বিভোর রাজ্যের আপামর মানুষ।

পশ্চিমবাংলা সহ সারা ভারতে নকশাল-আন্দোলন, জরুরী অবস্থা এবং তার মোকাবিলায় রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস-সরকারগুলি তার শাসনাধ্যায়কে তখন এমনি ভয়ংকর ভাবে রক্তাক্ত করে ফেলেছে যে, সেগুলির পক্ষে বহুকাল ধরে আপন আপন মুখকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া ভিন্নতর কোন উপায় ছিল না। এমত সময়েই প্রফুল্ল সেনের দলহীন গণতন্ত্রের ডাকে অজয় মুখার্জীর হাত দিয়ে লালঝান্ডাকে জয়প্রকাশজীর পদমূলে গচ্ছিত রেখে যিনি পরিবর্তনমুখী ঝড়ের দাপটে গণতন্ত্রের পথ বেয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন—ক্ষমতায় আসার পর তিনিই প্রায় প্রতিদিনই বলতেন—'মানুষ কেন যে এখনও কংগ্রেসে ভোট দেয়'! অর্থাৎ গণতন্ত্র রইবে কিন্তু বিরোধীপক্ষ থাকবে না!...

ক্ষমতায় আসার আগে যিনি স্বয়ং বি সি রায়কে বলেছিলেন 'বিড়লাবাড়ীর রহস্যময় চিড়িয়া' তিনিই ক্ষমতায় এসেই নিজের নির্বাচনকেন্দ্রে বিড়লার দান কুড়ি হাজার প্লাস্টিক ব্যানারে নিজের ছবি সহ লিখিয়ে নিলেন মার্ক্সবাদের নাম (সাতগাছিয়ায় প্রথমবারে)। ধীরে বহে গঙ্গা। ভারতে কংগ্রেস এবং বিজেপি শাসিত দুর্বল কেন্দ্রের সরকারের সুযোগ নিয়ে তার অঘোষিত কার্যক্রমে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতের জনসংখ্যার ভারসাম্য বিনাশ এবং অপরদিকে সিমির মতো জঙ্গি সংগঠনকে দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়ে অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠন সম্পর্কে কার্যত নীরবতা পালন—তার সংখ্যালঘু প্রীতিকে বর্ধিত করে। তার শাসনকাল বামপন্থার ইতিহাসে লেনিনবাদের চর্চা থেকে উপলব্ধি এবং অধ্যয়ন থেকে শিক্ষাকে নিপাত করে ছাত্র-যুব-নতুন প্রজন্মের কর্মী—সকলেই বিস্মৃত হয় যে মার্ক্সবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃতি, মার্ক্সবাদ সর্বোপরি একটা জীবনচর্চা। ফলে তারই শাসনকালে রাজ্যে এসে গেল লেনিনবাদের আগ্রাসনের সাথে 'করে কম্মে খাওয়ার' নতুন সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির নামেই রেজিমেন্টেশানের সাথে গড়ে তোলা হলো একটা আগ্রাসী দমননীতি, পুরোদস্তুর ফ্যাসিজিম। ফলে সারা রাজ্যে ঘটে চল্‌লো ইসলামপুর, হরিহরপাড়া, গড়বেতা, ছোট আঙারিয়া, সূচপুরের মতো নারকীয় ঘটনা। সেই সব ঘটনা থেকে সমাজে জন্ম নিল নানান জাতগোত্রের উল্লুক-ভল্লুক, বিনয় কোঙার, লক্ষণ শেঠ, অনিল বোস, সুশান্ত ঘোষ প্রমুখ নেতা-আধা নেতা-সিকি নেতা। কিন্তু একেকজন মহাশক্তিশালী একেকজন অত্যাচারী ব্যক্তিসত্তা। মার্ক্সবাদী শিবিরের ভেতর থেকেই যখন এর প্রতিবাদ এলো, তখন তিনি খোদ নৃপেন চক্রবর্তীকে বানালেন পাগল, পদাতিকের কবি সুভাষ মুখার্জীকে বললেন বিপথগামী, বিনয় চৌধুরীকে করলেন কার্যত নজরবন্দী। নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনের মতো মানব অশ্রু সেদিন নীরবে ঝরলো—পশ্চাদপদতার ছায়াচ্ছন্ন গুহায় বঙ্গজননী হলো বন্দিনী।...

হ্যাঁ। বাংলা নেহেরুর সময়ে ছিল 'মিছিলের শহর'। 'তার' জমানার প্রথমার্ধে রাজীবশাসনে সে শহর হলো 'মুমূর্ষু'। 'তার' তিরোধানের আগে সেই বাংলা আবার হলো 'কিলিং ফিল্ড'। তবু শিল্প ধরতে প্রায় বাইশবার তিনি বিদেশে গেছেন, প্রত্যেকবারই তিনি শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন। খলের যেমন ছলের অভাব হয় না—তারও তেমনি অত্যাচার ও কেলেঙ্কারির নানান প্রেক্ষাপটে আটবার কমিশন বসাতে কষ্ট হয়নি! কষ্ট হয়নি এই কারণে যে, তাকে কোনওদিন কোনও একটি কমিশন রিপোর্টকেই প্রকাশ করতে হয়নি। এভাবেই যেখানে তৃপ্তি ছিল, তার সময়ে সেখানেই এসেছে গণতান্ত্রিক আড়ম্বর, যেখানে শান্তি ছিল, তার সময়ে সেখানেই এসেছিল অঘোষিত সমর। নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখায় রাত্রিদিন জীর্ণ হয়েছে মার্ক্সীয় শাস্ত্রে, গানে, বিচিত্রানুষ্ঠানে বিচিত্র বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র কলরবে। রাজ্যবাসী পেয়েছে কোন শিক্ষা?—পেয়েছে সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত হীনতার দীক্ষা।...

যদিও একমাত্র অর্জন তার কর্মচারীর বেতনবৃদ্ধি যা এসেছে অন্যান্য রাজ্যগুলির সাথেই—এবং ভূমি সংস্কার যার রূপকার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সেই 'জহ্লাদ' সিদ্ধার্থ রায়। সেই 'খুনী' সিদ্ধার্থ রায় একটা উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডার, সিলিং বহির্ভূত পাঁচ লক্ষ একর ঘোষিত খাসের জমি এবং মোটামুটি একটা নিরপেক্ষ দক্ষ প্রশাসন 'তার' হাতে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, দু'-হাজার সালে তিনি সরকারী আয়ের প্রায় একচল্লিশ শতাংশ কেবল ঋণের সুদ মিটিয়ে, রাজ্যবাসীর মাথায় তেষট্টি হাজার কোটি টাকার ঋণ চাপিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে বুদ্ধ ভট্টাচার্যের 'আমরা'য় পরিণত করে তিনি বাধ্য হয়ে অবসর যাপনে অপসারিত হয়েছিলেন। সেই তিনিই প্রয়াণের পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেলেন "জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক এক মহৎ সন্তানের" স্বীকৃতি, দেবগৌড়ার কাছে পেলেন 'নির্লোভ এক বীরের' শিরোপা, দেশ ও জাতির কাছে পেলেন আচার্য জয়প্রকাশ এবং গান্ধীজীর সম-মর্যাদা। জীবনের বহু বছর যিনি নানান অছিলায় জাতীয় পতাকা পর্যন্ত উত্তোলিত করেননি, মৃত্যুর পরে জাতীয় পতাকাই আচ্ছাদিত করেছিল তাকে—বিশ্ব ইতিহাসে অনৈতিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ এক সর্বোচ্চ কৌতুককর দৃশ্য।...

তাই, সে আসছে। তার পদধ্বনিতে বাসন্তিক ঘূর্ণীঝড়ের দাপটে জীর্ণপাতার খসে পড়ার মতো টুপটাপ করে ঝরে যাচ্ছে রক্তরঙা মানুষ, অন্যেরা আতঙ্কিত। সে আসছে ধূলি উড়িয়ে ঝড় তুলে—ঝড়ের সেই বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে সব শীতের কুয়াশা। ভয় পাচ্ছে অত্যাচারীর দল—বসন্তের লাল আবিরের সাথে তারা তাই বারবার মিশিয়ে দিচ্ছে রক্তের রঙ।...

তবু সে আসছে, সে আসছে, পরিবর্তন আসছে...

॥ সমাপ্ত ॥

Swastika
22 March - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

জোড়াসাঁকোয় রবি-আলয়

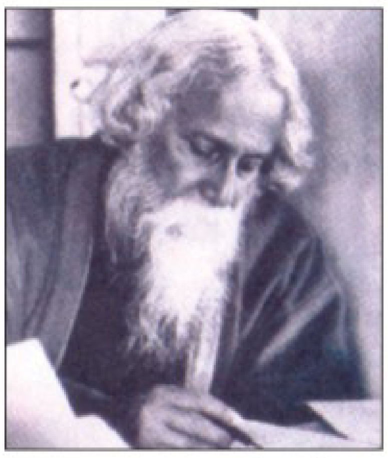

ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরদালান

ভেঙ্গে তোমার ঘরের চাবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেড়শ' বছর (১৮৬১-২০১১) পূর্তি উপলক্ষে এখন সংস্কারের হাওয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির আনাচে-কানাচে। এক নিঝুম দুপুরে সেখানে আড়ি পাতলেন স্বস্তিকা-র প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

ঝনাৎ ঝনাৎ একটা শব্দ। বোধ হয় কেউ তালা খুলছে। কিন্তু চাবি কই? কনসার্টে তখন অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনা— 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' ঠিক, চাবি খুলছে রবি কবির জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির। ওই যে সিঁড়ি। তারই ডানপাশে আঁতুড়ঘর। সেই ঘরে দোদুল্যমান তিনটে ছবি। একটাতে রবিঠাকুর, অপরটাতে দেবর্ষি দেবেনঠাকুর, আরেকটাতে রবিজননী রত্নগর্ভা সারদাদেবী। কিন্তু তুমি কেন বেরোচ্ছ না রবিঠাকুর? তুমি কি কেবলই ছবি? সুরমূর্চ্ছনা এতক্ষণে ঝংকার তুলেছে— 'না পেয়ে তোমার দেখা, দিন যে আমার কাটে না রে!' বেশ ভয় ভয় করছে। শেষে চোর দায়ে না ধরা পড়ি! ঠাকুরবাড়ির সেই দারোয়ান-এর বংশধরেরা আজও আছেন কিনা কে জানে! যে দারোয়ান সাধারণ মানুষের মতো দেখতে একটা চোরকে একবার বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল। সেই যে একবার তোমার ভাগিনেয় হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়ানো শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ তোমাকে প্রথমবার পদ্য লিখতে বলায় যে দশা হয়েছিল, এই অবস্থাটা বোধ হয় তার থেকেও করুণ রবিঠাকুর। যা' হোক, কোনও ক্রমে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি। জাপান আর তাঁর যাবতীয় কৌতুক নিংড়োনো উঠোনগুলো পেরোতেই ... ওরে বাবা এ যে বিশাল বড় হলঘর। যা থাকে কপালে! আগে ঢুকে তো পড়ি। কিন্তু এঁরা কারা? এই যে বিশাল তৈলচিত্রে বাঁধানো মহারাজা বাহাদুর প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, বাবু স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর— এঁদের যে চিনতে পারছি না। বাকিগুলো তো তবু চেনা যায়। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ— এঁদের দিব্যি চিনতে পারছি। কিন্তু ইনি আবার কে? রাজা রমানাথ ঠাকুর। যাঁর দলিলপত্র ও জোব্বা সযত্নে শায়িত রয়েছে। বুঝেছি রবি ঠাকুর। সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। তোমার সার্ধশতবর্ষে যেন সব মিলে গেছে। জোড়াসাঁকোর ছেলের হাত ধরে বেরোনো বেঙ্গল হরকরা আর

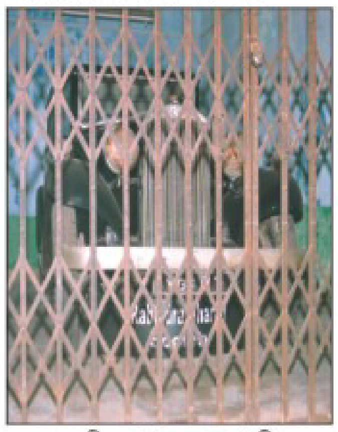
রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গাড়ী

পাথুরেঘাটার ছেলের হাত দিয়ে বেরোনো সংবাদ প্রভাকর-এর যাবতীয় দ্বন্দ্বের বোধ হয় অবসান হলো এবার। আরও স্পষ্ট করে বললে, মিলে গেছেন পাথুরেঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর আর তাঁর সহোদর জোড়াসাঁকোর নীলমণি ঠাকুর (ইনিই রবিঠাকুরের বৃদ্ধ প্রপিতামহ)। সবই তোমার কৃপা। সেই কৃপাতেই কয়লাঘাটের ঠাকুর পরিবারের ইনি রমানাথ ঠাকুর, যাঁর তৈলচিত্র শোভাবর্ধন করছে জোড়াসাঁকোয়!

রবিঠাকুর তোমার অনেককালের খাজাঞ্চি রসিক কৈলাশ মুখুজ্যেকে আজ বেশ মনে পড়ছে। ভাবছি, তার মতো তোমাকেও প্ল্যানচেটে ডাকি। কিন্তু তার মরণোত্তর রসিকতাটা স্মরণ করে সেই ইচ্ছের জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছি। তোমার জীবনস্মৃতির গগনঠাকুর অঙ্কিত কিছু অসাধারণ চিত্রপট। যেমন জল পড়ে, পাতা নড়ে কিংবা বাড়ির ভেতরের সেই স্বর্গের বাগান।

তুমি চলে যাবার সাত দশক পরে সবকিছু এখানে নীরবে পাল্টে যাচ্ছে রবিঠাকুর। খাঁচার পাখি আর বনের পাখি বোধ হয় এবার এক হয়ে যাবে। সেই যে ছেলেবেলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তোমার খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রদাদাকে দেখেছিলে রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে নবনাটক লিখিয়ে অভিনয় করাতে। সেই স্মৃতি আবার ফিরবে জোড়াসাঁকোয়। কারণ, ওই যে দেখা যাচ্ছে, সংস্কার হওয়া নতুন সিমেন্টে শানবাঁধানো ঠাকুরদালান। ফিরবে রবিঠাকুর, সেই গোলাবাড়ির স্মৃতিও ফিরবে। বাড়ির উত্তর অংশে ওই যে একখণ্ড পোড়ো জায়গা। যাকে খেলার জায়গা বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে তুমি। সেটা তোমার বাসের স্থান নয়, ব্যবহারের ঘর নয়, সেটা কাজের জন্যও নয়, সেটা বাড়িঘরের বাইরে, তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনও ছাপ নেই, সেটা শোভনীয় অনাবশ্যক পতিত জমি, কেউ সেখানে ফুলের একটা গাছও বসায়নি। সেই কারণেই বলেছিলে, এই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছেমতো কল্পনায় কোনও বাধা পেত না। তোমার কাছে ছুটির দিনের অর্থই ছিল রক্ষকের শাসনের একটুমাত্র রন্ধ্র দিয়ে এখানে পালিয়ে আসা। রবিঠাকুর তোমার সেই টানের জায়গাটা আবার ফিরে আসবে জোড়াসাঁকোয়। ফিরে আসবে ছেলেবেলার শিশুগাছ, তেঁতুলগাছ কিংবা চীনে বটগাছ-এর স্মৃতিও।

সাংবাদিকরা খালি জানতে চায়, কোন ঘরটা তোমার জ্যোতিদাদার স্ত্রী কাদম্বরীদেবীর, কোন ঘরেই বা থাকতেন তোমার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী। কিন্তু কি করে জানা যাবে? যদি তুমি না বল! কারণ রক্ষণশীলতা আর শিক্ষা-সংস্কৃতি এবাড়িতে যেন পাশাপাশিই পথ হেঁটেছে। সারা কলকাতা যখন দুর্গোৎসবের স্মৃতি-মেদুরতায় ডুব দিয়েছে, এবাড়ির একতলা থেকে তিনতলা, তখন সাজছে মাঘোৎসবের জন্য। কিন্তু তুমিই বা কতটা বলতে পারবে? শৈশবের ভৃত্যতন্ত্র থেকে বৌদিদিদের জিম্মায় যাবার মাঝে কিছু বদলায়নি তো? ইতিহাসনিষ্ঠ প্রদর্শনী আর সংগ্রহশালায় এবার তোমায় দেখবে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী। শুধু তোমার জীবনস্মৃতির পটে আঁকা ছবিতেই চিনে নেবে বিশ্ব আঠেরো-উনিশ শতকের নারী জাগরণের কেন্দ্রবিন্দুটিকে। অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে তোমার কালো রঙের গাড়িটা কি এবার একটু নড়ে উঠল? ঠাকুর দালানের পায়রাগুলো জানান দিল— বকবকম্ বকম, মানে ঠিক ঠিক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সংস্কারজনিত যাবতীয় তথ্য যুগিয়েছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো কেন্দ্রের জনসংযোগ আধিকারিক সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য। এই পাতার ছবিগুলি তুলেছেন শিবু ঘোষ।

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, '১০

নববর্ষ সংখ্যা - ১৪১৭

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের ভাষায় হিন্দুত্ব মানে জীবনধারা। কিন্তু বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার অক্টোপাশে হিন্দুরা আবদ্ধ। দেশভাগ এবং অনুপ্রবেশের বিড়ম্বনায় হিন্দুরা আজ আশঙ্কিত। বস্তুত বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ কি? কেমন রয়েছে পদ্মাপাড়ের হিন্দুরা – এসব নিয়েই স্বস্তিকার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা।

– লিখেছেন –

মোহনরাও ভাগবত, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, তথাগত রায়, দীনেশচন্দ্র সিংহ, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ গুহ, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, গূঢ়পুরুষ, শ্যামলেশ দাস, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ মজুমদার, অরিন্দম মুখার্জী, প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী, নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য প্রমুখ।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ দশ টাকা।।
২৭ মার্চের মধ্যে এজেন্টরা কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com